আমরা সবাই চাবেস	... ২
অর্থমন্ত্রীর তৃণমূলী বাজেট	... ৩
রাষ্ট্রের মদতে পুষ্ট পুলিশের অপরাধ	... ৪
চাষি মরছে দাম না পেয়ে ...	... ৫
সি পি আই (এম এল) নবম কংগ্রেসের খসড়া (৮)	... ৬-৮
উগো চাবেস ঃ সেনানায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক	... ৯

গণদাবী

₹ - ২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২০ সংখ্যা ১০ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ২১ মার্চ ২০১৩

অবাধ, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য

নির্বাচন কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে সি পি আই (এম এল) রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে গত ১৫ মার্চ সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ ও কলকাতা জেলা কমিটি সদস্য অমলেন্দু বিকাশ চৌধুরী। স্মারকলিপিতে বলা হয়—

অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনার ও কমিশন যে উদ্যোগ ও মনোভাব নিয়েছেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে। রাজ্য সরকারের একগুঁয়ে মনোভাব এবং সাংবিধানিক ও স্বশাসিত সংস্থার অধিকারকে নস্যাৎ করার সমস্ত প্রচেষ্টাকে আমরা দৃঢ়ভাবে নিন্দা করি। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করা, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ এবং নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের অধিকার ও কর্তৃত্বকে নস্যাৎ করার যে কোন প্রচেষ্টাকে রাজ্যবাসী তীব্রভাবে ধিক্কার জানায়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে যে সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছে এবং তৃণমূলস্তরে গণতন্ত্রকে যেভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে তাতে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই কম। এমনকি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বিশেষত, আমাদের মত সংগ্রামী বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া, জনগণের দাবি-দাওয়ার সপক্ষে প্রচার অভিযান চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি শাসক দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যেভাবে সশস্ত্র সংঘাত চলছে তা ইতিমধ্যেই এই আশঙ্কাকে আরও দৃঢ় করছে। রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের চোখের সামনে অবাধে দরিদ্র কৃষক-ক্ষেতমজুর ও সাধারণ মানুষকে জমি ও বসত থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। অজস্র মিথ্যা মামলায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের গ্রেপ্তার ও পুলিশী হয়রানি চলছে।

এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমরা দাবি করি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রায় ৭০,০০০ বুথে জনগণের মত প্রকাশ ও প্রতিনিধি নির্বাচনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরালো করতে হবে।

ইতিমধ্যেই হুগলী জেলার ধনেখালি, পোলবা-দাদপুর, পাণ্ডুয়া, বলাগড়; নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া, চাপড়া, নাকাশিপাড়া, পলাশীপাড়া; বর্ধমান জেলার কালনা, পূর্বস্থলী-১ এবং ২, মেমারী-১ এবং ২; হাওড়া জেলার বাগনান; উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটি গ্রামীণ, অশোকনগর গ্রামীণ, গাইঘাটা; দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উস্তি, ডায়মণ্ড হারবার, বিষ্ণুপুর-১ ও ২, বজবজ; বাঁকুড়া জেলার ওন্দা, হীরবাঁধ; মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি, কেলাই; বীরভূম জেলার রামপুরহাট-১, নানুর; উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমুণ্ডি অঞ্চলে সি পি আই (এম এল)-এর কর্মী ও সমর্থকদের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী না দেওয়ার জন্য হুমকী ও ভয় দেখানো শুরু হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকদের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েও বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের নোটিফিকেশন জারী হওয়ার পর থেকে এ ধরনের সন্ত্রাস আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই আমাদের আশঙ্কা। এ ব্যাপারে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

২০০৯-এর লোকসভা, ২০১১-এর বিধানসভা এবং বিগত ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলোতে আমাদের পার্টি **"পতাকায় তিন তারা"** প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের আবেদন এবারের ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে **"পতাকায় তিন তারা"** প্রতীক নিয়ে আমাদের প্রার্থীরা যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন তা সুনিশ্চিত করা হোক।

নন্দীগ্রাম মামলায় বিপ্রদাস চ্যাটার্জী ও নিতাই মণ্ডলের গ্রেপ্তারীর তীব্র নিন্দা এবং মুক্তির দাবি

৯ মার্চ ২০১৩ নন্দীগ্রাম মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে পার্টির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক বিপ্রদাস চ্যাটার্জীকে। হলদিয়া জেলে তাঁকে আটক রাখা হয়েছে। গত ২০ মার্চ এই একই মামলায় মহিষাদল থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে পার্টির জেলা কমিটির সদস্য নিতাই মণ্ডলকে। ২০০৭ সালের ৩ জানুয়ারী নন্দীগ্রাম মামলায় বিপ্রদাস চ্যাটার্জী, নিতাই মণ্ডল সহ ৬ জনকে হলদিয়া আদালত জামিনে মুক্তিও দিয়েছিল। ইতিমধ্যেই তদন্ত শেষ করে পুলিশ চার্জশীটও পেশ করেছে। অথচ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ৬ জনের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টে গত ২০ মার্চ সি আর পি সি-র ৪৮২ ধারায় এই মামলা খারিজ ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাতিলের দাবি জানিয়ে পার্টির পক্ষ থেকে মামলা করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি কানোয়ালজিৎ সিং আলুওয়ালিয়া জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাতিলের নির্দেশ দেন। তথাপি গ্রেপ্তারি ও পুলিশী হয়রানি চলছে। নিতাই মণ্ডলকে হলদিয়া জেল হাজতে রাখা হয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি আরেকবার রাজ্যবাসীর কাছে ধরা পড়ল। আমরা বিপ্রদাস চ্যাটার্জী, নিতাই মণ্ডল সহ ৬ জন সি পি আই (এম এল)-এর কর্মী ও নেতার বিরুদ্ধে সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও অবিলম্বে তাঁদের মুক্তির দাবি জানাই।

কাটোয়া ধর্ষণের মামলায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গণ ডেপুটেশন

কাটোয়া মহকুমা শাসকের কাছে গণ ডেপুটেশন।

গত ১২ মার্চ কাটোয়া মহকুমা শাসকের কাছে কাটোয়া ধর্ষণকাণ্ডে যুক্ত দোষীদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন ও ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচার করা ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সি পি আই (এম এল)-এর ব্যানারে প্লাকার্ড নিয়ে কাটোয়া স্টেশন থেকে মিছিল করে মহকুমা শাসকের অফিসে যাওয়া হয়। এই মিছিলে বিড়ি শ্রমিক মহিলাদের ভাল অংশগ্রহণ ছিল।

বিগত ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২ কাটোয়া আমোদপুর ন্যারো গেজ রেল লাইনে দুষ্কৃতিরা অম্বলপুর গ্রামের এক মহিলাকে গণধর্ষণ করে। অভিযুক্তরা ধরা পড়লেও এখনও চার্জ গঠন করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে ধর্ষিতা মহিলার বাড়িতে ফোনে হুমকি আসছে। ১২ বছর আগে যিনি তাঁর স্বামী হারিয়েছেন, সেই বিধবা মহিলার পক্ষে এই ধরনের ঘটনার পর দুই মেয়েকে নিয়ে জীবন ধারণের জন্য জীবিকা অর্জনের পথও বন্ধ হয়ে গেছে।

আরও একটি ঘটনা গতবছর ঘটে। কাটোয়া থানার চর সাহাপুর গ্রামের এক ছাত্রী স্কুলে যাওয়ার পথে ধর্ষিতা হয়। এই ঘটনায়ও অভিযুক্ত ধরা পড়লেও এক্ষেত্রেও চার্জ গঠন হয়নি। এই ছাত্রীটির বাবা দিনমজুরের কাজ করেন, সামাজিক কারণে ও নিরাপত্তার অভাবে ছাত্রীটির স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। পুলিশ-প্রশাসন দায়সারাভাবে তদন্ত করছে। কয়েকদিন আগে পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য অশোক চৌধুরীর নেতৃত্বে কয়েকজন মিলে এই দুই ধর্ষিতার অবস্থা ও তাদের বর্তমান পরিস্থিতি জানার জন্য ঐ অঞ্চল দুটিতে তদন্তে জান। এই তদন্তের পরেই মহকুমা শাসকের কাছে নির্দিষ্ট কয়েকটি দাবি নিয়ে এবং তা কার্যকরি করার দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পাঁচজনের একটি টিম দেখা করেন। এই টিমে ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য মীনা পাল, অশোক চৌধুরী; সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির রাজ্য নেত্রী ইন্দ্রাণী দত্ত এবং কল্যাণী গোস্বামী ও ছাত্র নেতা শুভ। যে দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা হয়—(১) এই দুই ধর্ষণের মামলায় চার্জ গঠন করে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে এক মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া। (২) অম্বলপুর গ্রামের ধর্ষিতা মহিলার কন্যা ও চর সাহাপুর গ্রামের ধর্ষিতা ছাত্রীর পড়াশুনার সমস্ত ব্যবস্থা প্রশাসনিক ভাবে নেওয়া। (৩) এই দুই পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। (৪) সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং এদের আর্থিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। দীর্ঘসময় আলোচনার মধ্য দিয়ে মহকুমা শাসক জানান ১৫ দিনের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবেন। ধর্ষিতা ছাত্রী এবং অম্বলগ্রামের ধর্ষিতা মহিলার মেয়েদের পড়াশোনার সব দায়িত্ব প্রশাসন নেবে। ১ মাসের মধ্যে চার্জ গঠন করে মামলার নিষ্পত্তি ঘটানোর জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেবেন।

পার্টি প্রতিনিধিরা ১২ মার্চ যাওয়ার পর ১৪ মার্চ মহকুমা শাসক নিজে ঐ অঞ্চলে যান এবং দাবিগুলোকে কার্যকরি করার উদ্যোগ নেন ও ব্যবস্থা করেন।

সম্পাদকীয়

আর হাসছে না, ফুঁসছে

'পাহাড় হাসছে, জঙ্গল হাসছে'—মুখ্যমন্ত্রীর স্বরচিত এই ভাষ্য প্রভাব ফেলতে আর ফল দিচ্ছে না, বরং উল্টে এখন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সম্প্রদায়ককে হাস্যকর প্রতিপন্ন করছে। দার্জিলিং পাহাড় আর জঙ্গলমহলে শেষবারের সফরের রাজনীতি সেরে এসে সরকারের সর্বময়কত্রীর হাসি দেখে আসার কথা বলার আর মুখ নেই। কি দিয়ে আর কি ঢাকবেন! বৈদ্যুতিন চ্যানেলে পরিষ্কার ধরা পড়ে গেছে, পাহাড়ে জাতিসত্তার জনগণ ভীড় করেছিলেন সভাস্থলেই জঙ্গী বিক্ষোভের জানান দিতে; আর জঙ্গলমহলে মূলবাসী জনতার বয়কটই জনসভাস্থলকে কিঞ্চিৎ তৃণমূলী জমায়েতে ক্ষান্ত থাকতে বাধ্য করেছে। পাহাড়ে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীর অগ্নিশর্মা চেহারা, 'রাফ অ্যাণ্ড টাফ' হওয়ার হুমকি দিতেও ছাড়েননি; আর জঙ্গলমহলে প্রকাশ হয়ে গেল শাসকের চরম মিথ্যাচারের মুখ।

পাহাড়ে জি টি এ মডেলে স্বায়ত্ততার উপহার জাতিসত্তার জনগণ, জনমুক্তি মোর্চা মায় অন্য কোনও প্রতিনিধিত্বকারি সংগঠনকেই সন্তুষ্ট করতে পারছে না। ক্ষমতার যে ভাগ কেন্দ্র-রাজ্যের আঁতাতে, বিশেষত রাজ্যের পৌরহিত্যে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে প্রত্যাশিত স্বায়ত্ততার স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ মিলছে না। অনুভূতি বলছে ছলনাই করা হয়েছে। বাজেট-বরাদ্দ যতটুকু যা ঘোষিত তা প্রাপ্যের তুলনায় বহুত্ কম, তাও ঠিকমত মেলে না, আর প্রশাসনিক যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার মূল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাজ্য প্রশাসন রেখে দিয়েছে নিজের হাতে। পার্বত্য জনতার স্বায়ত্ত শাসনের দাবি হল—'গোর্খাল্যাণ্ড'। দাবিটা বিবেচনার জন্য দ্বিতীয় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হোক। তা না করে বাংলাকে আর ভাগ হতে না দেওয়ার বাঙালী জাত্যাভিমানের জিগির তুললে, শায়েস্তা করার হুমকী দিলে, বিপরীতে ধূমায়িত পার্বত্য গণঅসন্তোষকে পুনরায় গণবিস্ফোরণের দিকেই ঠেলে দেবে। পার্বত্য দার্জিলিং এ পর্যন্ত স্বায়ত্ততার দাবিতে দুই পর্বের গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। প্রথম পর্বের দৌলতে মিলেছিল 'পার্বত্য উন্নয়ন পর্ষদ', দ্বিতীয় পর্বে মিলেছে জি টি এ। এর কোনটাই স্বশাসনের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা বিশিষ্ট নয়। তাই পাহাড় স্বাভাবিকভাবেই ফুঁসতে থাকবে পরবর্তী আলোড়নের উদ্দেশ্যে। সুতরাং 'মা-মাটি-মানুষে'র ধ্বজাধারী মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এই অবস্থায় পাহাড়ে হাসি দেখে আসার গপ্পো শোনানো সম্ভব নয়।

আর জঙ্গলমহলে! সেখানেও হাসির আর দেখা নেই। ভাবা হয়েছিল মেরে ধরে দাবিয়ে রেখে কিছু প্যাকেজ দিয়ে জঙ্গলমহলকে বুঝি কেনা গোলাম করে ফেলা যাবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বিনপুরের সরকারি জনসভার কর্মসূচীকে জনতা বয়কটই করেছে নীরবে। ঐ বয়কট নাম কিনতে মুখরা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ঝামা ঘসে দিয়েছে। বয়কটের কারণেই যে সভায় আদৌ স্থানীয় জমায়েত হয়নি, সেটা ধামাচাপা দিতে 'অসময়ে সভা আয়োজনের' দোহাই দিয়ে তড়িঘড়ি মুখ্যমন্ত্রীকে একাই বক্তিমে শুনিয়ে মুখ চুন করে চলে আসতে হয়েছে। আবার প্রমাণ হচ্ছে, কেবল দু'টাকা কিলো চাল, আত্মসমর্পণের পুরস্কারস্বরূপ পুলিশ লাইনে 'পুনর্বাসন', ফুটবল খেলার আসর, মেয়েদেরকে সাইকেল বিলি, জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনে কিছু দিনের কাজ দিয়ে জঙ্গলমহলে হাসি ফোটানো সম্ভব নয়। তাঁদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, দগ্ধাচ্ছে গণতন্ত্রের প্রশ্নে। যৌথ বাহিনীর অপারেশান গ্রীণ হান্টের শিকার হয়ে চলে গেছে কত প্রাণ, কত জীবনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে কারান্তরালে, কত মিথ্যা মামলার পাহাড়, কত বলাৎকার, আর 'শান্তি'র ভারপ্রাপ্ত তৃণমূলী ভৈরব বাহিনীর সন্ত্রাসী দৌরাত্ম।

মুখ্যমন্ত্রীর সভা কর্মসূচীর পরদিনই সংবাদজগতে খবর ছাপা হয়েছিল, জঙ্গলমহলের পূর্ণাপানিতে নাকি রাতের বেলায় আবার ল্যাণ্ড মাইন বিস্ফোরণের আওয়াজ মিলেছে, শঙ্কা হচ্ছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আবার অপারেশান নামানোর একটা 'উপলক্ষ' পাকানো হচ্ছে না তো!

আজকের দেশব্রতী সংবাদপত্রের মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত বিবৃতি
ফর্ম ৪ (ধারা-৮)

১।	প্রকাশন স্থান	২১/১/১, ক্রীক রো, কলকাতা-৭০০০১৪
২।	প্রকাশকাল	সাপ্তাহিক
৩।	মুদ্রক	কার্তিক পাল
	ভারতের নাগরিক কি না	হ্যাঁ
	ঠিকানা	২১/১/১, ক্রীক রো, কলকাতা-৭০০০১৪
৫।	সম্পাদক	অনিমেষ চক্রবর্তী
	ভারতের নাগরিক কি না	হ্যাঁ
	ঠিকানা	২১/১/১, ক্রীক রো, কলকাতা-৭০০০১৪
৬।	যাঁরা পত্রিকার মালিক এবং মোট	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি,
	পুঁজির ১ শতাংশের বেশী অংশীদার	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)
	বা শেয়ারহোল্ডার, সেই সমস্ত	২১/১/১, ক্রীক রো,
	ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা	কলকাতা-৭০০০১৪

আমি কার্তিক পাল এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলো আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(কার্তিক পাল)
প্রকাশকের স্বাক্ষর

আমরা সবাই চাবেস

কারাকাসের রাস্তায় ভালোবাসা আর প্রতিজ্ঞায় ভরা লাল পতাকায় সজ্জিত মানুষের ঢল সমস্বরে জানান দিচ্ছিল—''চাবেসের মৃত্যু হয়নি, তিনি ছড়িয়ে গিয়েছেন''। ''আমরা সবাই চাবেস আর লড়াই জারী থাকবে''। নিজের সাপ্তাহিক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে যিনি প্রায়ই নেচে গেয়ে উঠতেন, তাঁর আট কিলোমিটার দীর্ঘ শেষযাত্রায় সঙ্গীতের উপস্থিতিও দূরে থাকেনি। আলি প্রিমেরার একটি জনপ্রিয় গান ছিল ''জীবনের জন্য যারা মরেন তাদের কে বলে মৃত। এখন থেকে বেদনা নিষিদ্ধ''। ঠিকই, শোকপ্রকাশের সময় কোথায়? ভেনেজুয়েলার মানুষ জানেন একটি চলমান যুদ্ধ তাদের সামনে আছে, যে যুদ্ধ তাদের জিততে হবে। জিততে হবে যদি তাদের সদ্য ছেড়ে যাওয়া নেতাকে যোগ্য সম্মান দিতে হয়।

ধারাবাহিক যুদ্ধের প্রথমটি সংগঠিত হবে আগামী ১৪ এপ্রিল, যখন চাবেসের মনোনীত উত্তরাধিকারী, উপরাষ্ট্রপতি ও বর্তমান ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের মোকাবিলা করবেন। শুধু ভেনেজুয়েলার বিরোধীদের মোকাবিলা খুব কঠিন লড়াই নাও হতে পারে, কিন্তু কঠিন হবে তাদের বিদায়ী রাষ্ট্রপতির চলা পথকে জমানা বদলের পর ভেস্তে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পিত আমেরিকান ছককে পরাস্ত করা।

উগো চাবেসের মৃত্যুর পরদিনই ওয়াল স্ট্রীট পোষিত আমেরিকান এন্টারপ্রাইস ইনস্টিটিউট ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের পছন্দটা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়। হেনরিক ক্যাপ্রিলেস রেডোনস্কি এবং তার দল 'জাস্টিস ফার্স্ট'-কে সমর্থন জানিয়ে চাবেস পরবর্তী জমানায় আমেরিকান নীতি নির্ধারকদের পছন্দের দিকটি স্পষ্ট করে তারা লেখে, ''আমেরিকাকে অবশ্যই ভেনেজুয়েলাবাসীর গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের পাশে থাকতে হবে, যেখানে তারা তাদের দেশ এবং ভবিষ্যৎকে পুনরুদ্ধারের জন্য লড়ছে। তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে চীনের অর্থ, রাশিয়ান অস্ত্র, ইরাণীদের সন্ত্রাস এবং কিউবার দুর্বৃত্তদের দিয়ে দমন করার সমস্ত রকমের চেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে। সিরিয়ার ধরণে কোনও দমনও সহ্য করা হবে না''।

সহজেই বোঝা যাচ্ছে চাবেসের শারীরিক অনুপস্থিতির সুযোগে লাতিন আমেরিকার মাটি থেকে তাঁর কার্যক্রমের ধারাকেই সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করতে চাইছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চাবেস যে শুধুমাত্র তেল, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম এবং অন্যান্য শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ করেছিলেন, বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে ভেনেজুয়েলার মাটি থেকে উৎখাত করেছিলেন তাই নয়, তার নেতৃত্বেই ভেনেজুয়েলা কিউবাকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, গঠিত হয়েছিল ''আমাদের আমেরিকার বলিভারীয় সংহতি'' বা আলবা। আলবা মার্কিন নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যের এক বিকল্প গড়ে তুলতে চাইছিল আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতির মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা বাদ দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ৩৩টি দেশের এক সংহতি, সেলাক। মধ্যপ্রাচ্য আমেরিকার পয়লা নম্বরের শত্রু ইরানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। আমেরিকার বিদেশ নীতির সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ সমালোচক হিসেবে কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন আফগানিস্তান, ইরাক এবং লিবিয়ায় আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের, গাজায় ইজরায়েলি হানার।

সাম্রাজ্যবাদের এই জঙ্গী বিরোধিতার পাশাপাশি প্রগতিশীল বিকল্প গড়ে তোলার দিকটাই আমেরিকাকে আরও বেশি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। গত পঁচিশ বছরের জমানায় চাবেসই ছিলেন সবচেয় শক্তিশালী নেতা, যিনি সমাজতন্ত্রের স্বপ্নটাকে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং জনপ্রিয় করেছিলেন। নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যৌথতার, যেখানে সাম্য, স্বাধীনতা এবং গভীর ও বাস্তবিক গণতন্ত্র নতুন মাত্রা পেয়েছিল আর জনগণ উঠে এসেছিল নায়কের ভূমিকায়। বাস্তব অবস্থাকে ছাপিয়ে সচেতনভাবেই নতুন কিছু তৈরি করার পরিস্থিতি তিনি তৈরি করতেন। গত বছর যে রাজনৈতিক মঞ্চে তিনি পুনর্নির্বাচিনের দাবি তুলেছিলেন, সেখানে তার স্পষ্ট বক্তব্য ছিল—''আমাদের নিজেদের বোকা বানানোর দরকার নেই। ভেনেজুয়েলার এখনো যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান তা পুঁজিবাদই, সমাজতন্ত্র এখানে সদ্য তার নিজস্ব গতিমুখে পা ফেলা শুরু করেছে। সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রা করার জন্য আমাদের দরকার জনগণের শক্তি, যা ভেনেজুয়েলায় এখনো বিদ্যমান দমন, শোষণ এবং আধিপত্যের দিকগুলোকে মুছে ফেলতে পারবে।''

উগো চাবেস জীবনের জন্যই লড়াই করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর কথা এবং কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর দেশ এবং মহাদেশে যে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিলেন, গোটা দুনিয়াতেই পড়েছিল তার অভিঘাত। ভারতের জনগণ সারা বিশ্বের মানুষের সঙ্গেই সবসময়ে তাঁর থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবে এবং তাঁর অসামান্য স্বপ্নকে সফল করে তোলার চেষ্টা করবে। উগো চাবেস দীর্ঘজীবী হোন।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ১২ মার্চ ২০১৩)

ভাঙড়ে আরাবুল, গার্ডেনরীচে ইকবাল, ধাপায় শম্ভুনাথ কাউ

তৃণমূলী দুষ্কৃতিদের হাতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত

মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করছে সি পি আই (এম এল)

১। ভাঙড়ে আরাবুল, গার্ডেনরীচে ইকবাল কাণ্ডের পর কলকাতা মহানগরীর পূর্ব প্রান্তে ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে দমকলমন্ত্রী জাভেদ খানের আশীর্বাদপুষ্ট তৃণমূলী দুষ্কৃতি তথা কাউন্সিলার শম্ভুনাথ কাউ ও তার দলবলের হাতে খুন হল আরেক তৃণমূল নেতা অধীর মাইতি। মেয়র শোভন চ্যাটার্জী, দমকলমন্ত্রী জাভেদ খানের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় শম্ভুনাথ কাউ-এর দলবল ধাপায় ২৭ কাঠা জমি দখলের অভিযানে নামে। দলের অন্য গোষ্ঠীর বাধাকে দুর করতেই খুন করা হল অধীর মাইতিকে। এভাবেই শহর ও রাজ্যজুড়ে তৃণমূলী দুষ্কৃতিদের হাতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হচ্ছে তাই নয়, জনগণের নিরাপত্তা ও গণতন্ত্র বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী কখনও 'ছোট ঘটনা', কখনও 'ষড়যন্ত্র' বলে তাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও দিনের পর দিন যেভাবে সন্ত্রাস নেমে আসছে তাতে প্রশাসন ও পুলিশবাহিনী শুধু নির্বাক দর্শক নয়, কখনও কখনও তার বলিও। বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলছে, মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা এড়িয়ে জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করে চলেছেন। রাজ্যের বিপর্যস্ত আইন শৃঙ্খলা ও জনগণের নিরাপত্তার প্রশ্নে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি এবং অবিলম্বে এই সন্ত্রাস ও গুণ্ডামী বন্ধের জন্য জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।

অর্থমন্ত্রীর তৃণমূলী বাজেট—বেকারদের নিয়ে দ্বিগুণ রসিকতা

বাজেট মানে অনুমিত আয় ব্যয় বা জমা খরচের হিসেব। ভারতের মত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দেশে রাজ্যগুলো তাদের নিজেদের আয়-ব্যয় ও জমা খরচের আনুমানিক হিসেব বছর শুরুর আগে প্রস্তুত করে। অবশ্য কেন্দ্রীয় স্তরে অনুরূপ বাজেট তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে এক্ষেত্রে বড় তফাৎ হল যে, রাজ্য কেনমতেই জমার থেকে বেশি খরচ করতে পারে না, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা পারে কেন না নোট ছাপানোর অধিকার কেন্দ্রের রয়েছে রাজ্যের নেই। তাই রাজ্যের বাজেট তৈরীর ক্ষেত্রে নমনীয়তা কম। এই প্রেক্ষিতেই সাম্প্রতিক বা সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য রাজ্যের বাজেটকে দেখতে হবে। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে কোন একটি জোট বা দল নিজেদের তাগিদে রাজ্যের দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য জনগণের দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন এবং যেভাবেই হোক জনগণের ভোটে জিতে ক্ষমতার গদিতে বসেছেন। তাই জনগণের ন্যূনতম চাহিদা শাসক দলকে মেটাতে হবে অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিশ্রুত পানীয় জল এবং কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত তাদের করতে হবে। প্রতি বছরের বাজেট সেই লক্ষ্যে কতদূর প্রসারিত হল সেটা অবশ্যই বিবেচ্য।

সাধারণভাবেই বাজেট ভাষণে শাসক দলের অর্থমন্ত্রী নিজের সরকারের গুণগান করতে থাকেন, যাকে বলে নিজের ঢাক নিজে পেটানো। এক্ষেত্রে কেন্দ্র রাজ্য, অমিত মিত্র বা অসীম দাশগুপ্ত বা চিদাম্বরম বা অন্য কোন অর্থমন্ত্রী কেউই ব্যতিক্রম নন। অমিতবাবুও তাঁর বাজেট বক্তৃতায় নিজের ও সরকারের সাফল্যের সাতকাহন গেয়েছেন, কী রাজস্ব আদায়ে কী পরিকল্পনা খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে। যদি ২০১২-১৩ সালের সংশোধিত অনুমিত আয়ের দিকে একটু চোখ ফেরানো যায় তাহলেই তাঁর ৩০ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধির ফাঁকা আওয়াজের ধাপ্পা টের পাওয়া যায়। যে বর্ধিত রাজস্ব আদায় হয়েছে তার মধ্যে ১৬০০ কোটির বেশী হল পেট্রোপণ্যের বর্ধিত মূল্যের জন্য পাওয়া অতিরিক্ত বিক্রয় কর এবং কয়লার উপরে প্রাপ্ত অতিরিক্ত সেস। অর্থাৎ কেন্দ্র জ্বালানির মূল্য বাড়ানোর দরুণ পাওয়া টাকা। যদি ঐ ১৬০০ কোটির বেশী টাকাকে মোট রাজস্ব থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে রাজস্ব বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২৩ শতাংশের একটু বেশী। কোন রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সূচক হল বিক্রয় কর, কেন না অর্থনৈতিক কাজকর্ম বাড়লে বিক্রয় কর আদায় বাড়বেই। এক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশ। কেবল তাই নয়, ২০১২-১৩-র বাজেটে যে অনুমান করা হয়েছিল তার থেকে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা কম বিক্রয় কর আদায় হয়েছে। তাই রাজ্যের অর্থনৈতিক কাজকর্মের অমিত বৃদ্ধির ভাষণটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। আয়ের অন্য একটি অংশ হল কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রাপ্য বিভিন্ন কর বা শুল্কের ভাগ। এক্ষেত্রেও সেবা-কর ব্যতিরেকে অন্য সব ক্ষেত্রে পাওনা কমই হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রের কাছ থেকে ম্যাচিং গ্রান্ট, অর্থাৎ যা পেতে গেলে রাজ্যকেও অর্থ যোগান দিতে হয়, হিসেবে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ অনুমানের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা বা প্রায় ২৬ শতাংশ কম পাওয়া গিয়েছে ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে। সামগ্রিকভাবে ২০১২-১৩ সালের আয়ের ছবি এমন কোন আশার আলো দেখাচ্ছে না যা থেকে বলা যায় যে, আগামী বছরে অর্থনৈতিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ফেরাবে। **মূলধনী খাতে খরচের চিত্রটিও যথেষ্ট খারাপ। ২০১২-১৩-র বাজেটে ধরা হয়েছিল ১৬৪৪৯ কোটি টাকা মূলধনী খাতে ব্যয় করা হবে**, কিন্তু আদতে তা হয়েছে ১৫১৩৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের থেকে প্রায় ৮ শতাংশ কম। মূলধনী খাতে ব্যয় রাজ্যের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। যেটা আশানুরূপ হয়নি।

রাজ্য বাজেটে ব্যয়ের দিকের ছবিটাও যথেষ্টই হতাশাব্যঞ্জক। ২০১২-১৩ সালে পরিকল্পনা খাতে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৩৩৭১ কোটি টাকা কিন্তু ব্যয় করা হয়েছে ২৩০১৯ কোটি টাকা, বাজেটের থেকে ৩৫২ কোটি টাকা কম। এই বাজেট ধরা হয়েছে পরিকল্পনা খাতে ব্যয় করা হবে ২৬৬৭৪ কোটি টাকা, কিন্তু কীভাবে? ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের হিসেবের দিকে চোখ রাখলেই দেখা যায় যে, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ খরচ করা যায়নি। সেচে বরাদ্দ অর্থের থেকে ৩৬ শতাংশ কম ব্যয় হয়েছে, ১৫৬৮ কোটির জায়গায় ৯০৩ কোটি টাকা। পরিবহণ, আবাসন, মহিলা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ফুলের বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সড়ক, বিদ্যুৎ এইসব ক্ষেত্রে বাজেটের তুলনায় অনেক কম খরচ হয়েছে (তালিকা-১ দেখুন)।

তালিকা অনুযায়ী পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন ব্যতিরেকে অন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাজেট বরাদ্দের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় কম হয়েছে ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে। তাই বরাদ্দ আর বাস্তব ব্যয়ের সাযুজ্য ২০১৩-১৪ বছরে থাকবে তা বলা যায় না। অন্যদিকে সামাজিক ক্ষেত্রে মূলধনী খাতে ব্যয় ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে বরাদ্দ অর্থের তুলনায় যথেষ্টই কম হয়েছে, বরাদ্দ ছিল ২৮৮৬ কোটি টাকা আর হয়েছে ১৮৯২ কোটি টাকা, এ বছরের বরাদ্দ ৩৩৬৪ কোটি টাকা। অনুরূপে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বরাদ্দ করা ২৫০০ কোটি টাকার অর্ধেকও (১০৮৪ কোটি টাকা) খরচ করতে পারা যায়নি ২০১২-১৩ বছরে, কিন্তু বরাদ্দ করা হয়েছে ২৫২২ কোটি টাকা। সামগ্রিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মূলধনী খাতে বরাদ্দ ছিল ৭৯২৩ কোটি টাকা, যেখানে ব্যয় হবে মাত্র ৬০৯৪ কোটি টাকা। কিন্তু বরাদ্দ হয়েছে ৮৯২৫ কোটি টাকা।

তালিকা-১

পরিকল্পনা খাতে ব্যয় (কোটি টাকায়)

বিভাগ	২০১২-১৩ বাজেট	২০১২-১৩ সংশোধিত	২০১৩-১৪ বাজেট
মৎস্য	১৫৬	৯৫	১৬৫
সেচ ও জলবন্টন	১৫৬৮	৯০৩	১৭২৮
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১০৪৯	৮০৪	১২৬০
পানীয় জল	৮০০	৩৫৬	৯১০
পরিবহণ	৩৭৫	২১০	৩৮০
বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৫০০	৪৩৮	৫৪০
ভূমি ও ভূমি সংস্কার	৭৫	৫৬	৮০
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন	২৭১৭	৩৯৪৬	২৯৯০

উপরের সংখ্যাগুলো যে তথ্য দিচ্ছে তা এই যে, আয় কিংবা ব্যয় উভয় ক্ষেত্রেই গত বছরে যা বলা হয়েছে তা করা হয়নি। এ বছরেও যা বলা হচ্ছে তা করা হবে বলা যায় না। উপরন্তু মূলধনী খাতে ব্যয় যথাযথ না হওয়ায় ভবিষ্যতে রাজ্যের উৎপাদিকা শক্তি বিকশিত না হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যে ঋণ নিয়ে এত কথা হচ্ছে, সেই ঋণ নেওয়ার ঝোঁক কিন্তু পুরোমাত্রায় বর্তমান। ২০১১-১২ আর্থিক বছরের ২২১৯০ কোটির তুলনায় ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা কমে দাঁড়ায় ২০০৭১ কোটি টাকায়, কিন্তু তা আসলে বেড়ে দাঁড়ায় ২০৫০০ কোটি টাকায়, আর এ বছরে বাজেটে তা নির্দিষ্ট হয়েছে ২৫৮৩৮ কোটি টাকা, প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি।

বাজেটে যে ঘোষণাটি সব থেকে বেশী চর্চিত তা হল বেকারভাতা প্রদানের ঘোষণা। এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত ১ লক্ষ যুবক-যুবতীদের মাসে ১৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। অর্থাৎ বছরে ১৮০ কোটি টাকা লাগবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য অনুসারে ২০১১ সালে ছিল প্রায় ১ কোটি। তাহলে তাদের ভাতা দিতে লাগবে বছরে ১৮০০০ কোটি টাকা। সেই টাকা কোথা থেকে আসবে, নাকি ঐ ভাতা বেছে বেছে দেওয়া হবে, তা বোঝা যায়নি। এই বাজেটে ভ্যাটের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে ১ শতাংশ, নীচের দিকে যা আসলে বর্তমানের (৪ শতাংশ) তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশী। নিম্নহারের ভ্যাট চালু আছে সাধারণ মানুষের ভোগ্যপণ্যের উপরে। ফলে ঐসব জিনিসের দাম বেশ বাড়বে, যা মুদ্রাস্ফিতির জন্য নাজেহাল মানুষের ওপরে আরও চাপ বাড়াবে। অন্যদিকে উপরের দিকেও ভ্যাট ১ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে, যার অর্থ ধনীদের তুলনামূলকভাবে ভ্যাটের কম বৃদ্ধি।

অর্থমন্ত্রী বেকারদের নিয়ে রসিকতা করতেও ছাড়েননি। তিনি জানিয়েছেন, খুব নির্দিষ্টভাবে ২০১২-১৩ বছরে ১০,২৪,৫২১টি নতুন কর্ম সৃষ্টি হয়েছে। এরকম শেষ অঙ্ক পর্যন্ত সংখ্যা যখন নির্দিষ্ট করা হয় তখন তিনি নির্দিষ্টভাবে সেইসব ব্যক্তি ও কাজের নাম জানান। আমরা আমাদের সন্দেহ নিরসন করি। ঠিক কী উপায়ে এবং কোথায় সেইসব কর্মসংস্থান হল তা আমরা জানতে চাই। তার এই সাফল্যের প্রেক্ষিতে ২০১৩-১৪ বছরে তিনি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছেন ১৩,১৪,০০০। বেকারদের নিয়ে দ্বিগুণ রসিকতার বাজেট বক্তৃতা ছাড়া একে আর কী বলা যেতে পারে!

- অমিত দাশগুপ্ত

গণেশ পাইন মহৎ প্রাণ, মহৎ শিল্পী

শিলিগুড়ি থেকে কোনো লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক একটা প্রচ্ছদ চাইলেন। ম্যাগাজিনটা চেহারায় দীনদরিদ্র, বেকার সম্পাদকের নীরক্ত পকেট থেকে নিঃশেষে রক্ত নিংড়ে যা হয়, লেখাও তেমন উন্নত মানের নয় সব। কিন্তু এসব তিনি বড় করে দেখেন না। এঁকে দেন প্রচ্ছদ। হাওড়ার কোনো বাউণ্ডুলে কবি নিজের কবিতার বই ছাপবেন। তাঁরও চাই প্রচ্ছদ। দাবি নিয়ে হাজির হলেন। কয়েকদিন ঘুরে পেয়েও গেলেন। তুলনামূলকভাবে একটু সম্ভ্রান্ত কোনো ম্যাগাজিনের সম্পাদক গল্প সংখ্যা বের করবেন। ইলাস্ট্রেশন চাই। গল্পগুলো দেওয়া হল। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি গল্প অসামান্য। লেখকরাও বড় মাপের। সেই গল্পগুলোর ইলাস্ট্রেশন পেয়ে গেলেন সম্পাদক। এরকম অজস্র ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। সব পত্রিকা ও সম্পাদকদের নাম বলা যাবে না, সেটা সম্ভবও নয়, কারণ সেভাবে রেকর্ড নেই কোথাও, সব কপি রাখাও হয়নি। শিল্পীর নাম গণেশ পাইন। তিনি কতটা সাধারণ মানুষের শিল্পী, কতটা বড় মনের শিল্পী, ওপরের দু-চারটি উদাহরণ থেকে আশা করি বোঝা যাবে। পারতপক্ষে কাউকে ফেরান না। তবে কাজ করার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা তো থাকেই, তাতে হয়তো কাউকে লম্বা অপেক্ষায় থেকে ফিরে যেতে হয়েছে। কিন্তু সেটা ইচ্ছাকৃত ফেরানো নয়, নয় উপেক্ষা। বরং তিনি প্রচ্ছদ বা ইলাস্ট্রেশন এঁকে দিয়েই দায় সারেননি। ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়েছেন সেই সম্পাদক-কবি-লেখকদের সঙ্গে। শিল্প-সাহিত্য নিছক খামখেয়াল নয়, নয় নিছক একটা বয়সের উত্তেজনা বা টাইমপাস, জীবনে তার যোগ কত গভীর নিবিড় সে কথা তিনি বোঝাতেন গল্পচ্ছলে। মাস্টারি নয়, গুরুগিরি নয়, প্রকৃত অর্থেই গণেশ পাইন ছিলেন একজন কথাশিল্পী। এত সুন্দর করে কথা বলতেন, এত নরম ও অভ্রান্ত শব্দ চয়ন করতেন, এত চমৎকার করে শব্দগুলো গাঁথতেন, শব্দ গেঁথে গেঁথে ছবি গড়ে তুলতেন, তার মধ্যে মিশিয়ে দিতেন কৌতুক এবং প্রশ্নও, এমন মানুষ আমি খুব কম দেখেছি।

এ লেখা গণেশ পাইন কত বড় শিল্পী ছিলেন তা মূল্যায়নের চেষ্টা নয়। সে যোগ্যতা আমার নেই। অনেকেরই নেই। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় বা অন্য কোনো অভিপ্রায়ে যাঁরা রঙতুলির

চারের পাতায় দেখুন

কমরেড বিভাস বোস স্মরণসভা

২০ মার্চ কলকাতার স্টুডেন্টস হলে এ আই সি সি টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আয়োজনে প্রয়াত কমরেড বিভাস বোসের (বুড়োদা) স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রেখে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সঞ্চালক তথা এ আই সি সি টি ইউ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বোস। সভামঞ্চে আসন গ্রহণ করেন এ আই সি সি টি ইউ-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি অতনু চক্রবর্তী ও সহ-সভাপতি মীনা পাল। প্রয়াত কমরেড স্মরণে এক মরমীয়া রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুদেষ্ণা ও বাবলি চক্রবর্তী দ্বৈতকণ্ঠে। স্মরণসভায় আমন্ত্রিত ছিলেন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও সেক্টর ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

প্রয়াত কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন এ আই টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক রণজিৎ গুহ, সিটু রাজ্য সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত, ইউ টি ইউ সি নেতা বরুণ চৌধুরী, আই এন টি ইউ সি নেতা রমেন পাণ্ডে, ইফ্‌টু নেতা সুজন চক্রবর্তী, এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক দিলীপ ভট্টাচার্য, টি ইউ সি আই নেতা সুনীল পাল, ডব্লিউ বি এস আর ইউ নেতা আশীষকুসুম ঘোষ, বি এস এন এল এন এফ টি ইউ নেতা অম্লান ভট্টাচার্য, পরিবহণ শ্রমিক আন্দোলনের 'যুক্তমঞ্চ'-এর শরিক বর্ণালী মুখার্জী, বীরসুলহাট লেদার্স হকার্স ইউনিয়ন নেতা মহঃ শামীম, ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নেতা রাজদুলাল গোস্বামী, সি টি সি বি ডি কে এস নেতা বলরাম মাঝি, রেল ঠিকা শ্রমিক সংগঠনের নেতা এন এন ব্যানার্জী। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নাগরিক মঞ্চের পক্ষে গৌতম ঘোষ। উপস্থিত হতে না পারায় দুঃখপ্রকাশ করে বক্তব্য লিখে পাঠান প্রবীণ সাংবাদিক শংকর রায়।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, আজকের দেশব্রতীর সম্পাদক অনিমেষ চক্রবর্তী। সবশেষ বক্তা ছিলেন এ আই সি সি টি ইউ-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি অতনু চক্রবর্তী।

সকল বক্তাই প্রয়াত কমরেড বিভাস বোসের দীর্ঘ সাড়ে চার দশকের বিপ্লবী কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকের জীবন ইতিহাস থেকে শিক্ষাগুলো তুলে ধরেন এবং আগামী দিনের আন্দোলনের পথে এগিয়ে

চারের পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রের মদতে পুষ্ট পুলিশের অপরাধ

সম্প্রতি রেল পুলিশের দুটি কুকীর্তি উন্মোচিত হয়েছে যা রক্ষকদের ভক্ষক হওয়ার পুরনো প্রবাদটিকেই আরও একবার প্রতিপন্ন করেছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে বহরমপুর রেল স্টেশনে। তারাপিঠে পুজো দিতে যাবেন বলে এক দম্পতি বনগাঁ থেকে রাতের ট্রেনে বহরমপুর স্টেশনে নামেন। রাত অনেক হয়ে যাওয়ায় রাতটা বহরমপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে ভোরের বাসে তারাপিঠ যাওয়া মনস্থ করেন তাঁরা। বহরমপুর স্টেশনে রাতের ডিউটিতে থাকা কনস্টেবল পরিতোষ বিশ্বাস এসে ঐ দম্পতিকে জেরা করতে থাকেন। তাঁর জেরায় স্বামী দিলীপ তাঁর পদবি ঘোষ বলে উল্লেখ করেন, আর স্ত্রী রমাদেবী তাঁর পদবি বলেন বিশ্বাস, যেটি তাঁর বিয়ে হওয়ার আগের পদবি। দু-জনের বলা পদবির এই পার্থক্যের মধ্যে মদ্যপ কনস্টেবল (রমা দেবী কনস্টেবলের মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল ও তাঁর পা টলমল করছিল বলে অভিযোগ করেছেন) অবৈধ সম্পর্কের গন্ধ পেলেন এবং তার ফয়সালায় ৫০০ টাকা ঘুষ চাইলেন। তা দিতে অস্বীকার করায় পরিতোষ বিশ্বাস দিলীপবাবুকে লাঠি দিয়ে মারতে মারতে লাইনে ফেলে দিলেন। ফোন করে বাপের বাড়ির পদবি জেনে নেওয়ার রমাদেবীর হাজারো পীড়াপীড়িও কনস্টেবলের হাতে স্বামীর নির্যাতনকে আটকাতে পারল না। দিলীপবাবু ৪০ মিনিট রেল লাইনে পড়ে থাকলেন। স্থানীয় কিছু মানুষ দিলীপবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক এইভাবে কেড়ে নিল একটি নিরীহ-নিরপরাধ মানুষের প্রাণ, একটি পরিবারকে ডুবিয়ে দিল বিপর্যয়ের অন্ধকারে। ঐ কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি রেল পুলিশের নারী পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্পর্কিত। দমদম স্টেশনের দেওয়ালে কাজের বিজ্ঞাপন দেখে সেখানে দেওয়া ফোন নম্বরে জনৈক বাপি সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করেন বারাসতের এক মহিলা। মহিলার কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে বাপি পরদিন তাঁকে নিয়ে যায় ছত্তিশগড়ের রায়পুরে। সেখানে তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি পড়েছেন দেহ ব্যবসার চক্রের কবলে। যে মহিলার বাড়িতে তাঁকে রাখা হয় সেই মহিলা তাঁকে মারধোর করেন এবং দেহ ব্যবসায় নিজের শরীরকে বিকিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। তিনি অবশ্য কোনরকমে কলকাতায় পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। কিন্তু কলকাতায় এসেও তাঁর রেহাই মেলে না। বাপি সাহা মহিলাকে ফোনে হুমকি দিয়ে একটি স্থানে আসতে বলে, সেখানে সে চার পুলিশ কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে (যারা শিয়ালদহ রেল পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপের কর্মী বলে প্রমাণিত হয়েছে) মহিলা ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা করে। পুলিশ কর্মীরা মহিলাকে বলে—সে ছত্তিশগড় থেকে তিন লক্ষ টাকা ও চারটে মোবাইল চুরি করে এনেছে, ঐ টাকা তাকে ফেরত দিতে হবে আর না দিতে পারলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। মহিলাকে ছেড়ে দিয়ে টাকা আনতে বলা হয় আর স্বামীকে পুলিশ আটকে রাখে শিয়ালদহ রেল পুলিশের অফিসে। মহিলা ২৫০০০ টাকা ও কয়েক ভরি সোনার গয়না এনে দিলেও তার স্বামীকে ছাড়া হয় না, তাদের দাবি মত টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হতে থাকে। অবশেষে মহিলা গোয়েন্দা পুলিশের দ্বারস্থ হন এবং গোয়েন্দাদের হাতে ধর্মেন্দ্র সিংহ, বিশ্বজিৎ দাস, আলতাব হোসেন ও সইদুল মোল্লা নামে চার পুলিশ কর্মী গ্রেপ্তার হয়। দিল্লী গণধর্ষণের ঘটনার পর যখন নারীদের স্বাধীনতা ও মর্যাদার দাবিতে গোটা দেশ উত্তাল হল এবং সরকার ধর্ষণ-বিরোধী আইনকে কঠোরতর করা ও নারীর মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থাকে জোরদার করার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হল, তখন দেখা যাচ্ছে নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার ভার যাদের হাতে, সেই পুলিশই নারী পাচার, চক্রকে চালনা করছে। রেল পুলিশের অফিস হয়ে উঠেছে নারী পাচার চক্রের কেন্দ্র।

ওপরে যে ঘটনা দুটোর কথা বলা হল তা আমাদের ক্রোধান্বিত করলেও বিস্মিত করে না। ঐ দুটি কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত পুলিশ কর্মীদের পুলিশ বাহিনীর ব্যতিক্রমী সদস্য বলে মনে করারও কোন ভিত্তি থাকতে পারে না। কেননা, পুলিশের এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে সাধারণ মানুষ এতই পরিচিত, আসমুদ্র হিমাচল তাদের পাশবিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার এত সাক্ষ্য বহন করছে যে, জনগণের মনে পুলিশের এই কলঙ্কিত ভাবমূর্তিই গেঁথে রয়েছে। পুলিশ বললেই আমাদের মনে এমন এক বাহিনীর ছবি ফুটে ওঠে যারা মানুষের ওপর পাশবিকতা চালায়, যাদের হেফাজতে অত্যাচার-হত্যা-বেআইনি আটক-ধর্ষণের ঘটনা বারবারই ঘটে; মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘনের জন্য যাদের জবাবদিহি করতে হয় না, যারা নিয়মিত তোলা আদায় করে, মধুচক্র চালানো, ডাকাতি ও ধর্ষণের মত অপরাধে তাদের যুক্ত থাকার খবরও মাঝে মধ্যেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু এইরকম এক নির্মম বাহিনী হয়ে ওঠার, জনগণের কাছে এক আতঙ্কের বাহিনী হয়ে ওঠার পিছনে কোন ধারা কাজ করেছে? পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এই ব্যাপারে বিশেষ মতপার্থক্য নেই যে, স্বাধীন ভারতবর্ষের পুলিশ বাহিনী ঔপনিবেশিক জমানার পুলিশ বাহিনীর ছাঁচেই ঢালা। তাদের শাসনকে অটুট রাখার জন্য জনগণকে দমন করা, জনগণের ওপর নজরদারি চালানোর যে আদলে বিদেশী শাসকরা পুলিশ বাহিনী গঠন করেছিল, সেই আদল স্বাধীনতা পরবর্তী জমানায় শুধু অব্যাহতই রইল না, তাকে আরও পোক্ত করে পুলিশ বাহিনীর জনবিরোধী চরিত্রকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হল। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন দ্বারাই আজকের পুলিশ বাহিনীর চালিত হওয়ার ঘটনাটাই তো পুলিশ বাহিনীর ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য।

স্বরাষ্ট্র দপ্তর সম্পর্কিত সংসদীয় স্ট্যাণ্ডিং কমিটি ২০০২-এর এপ্রিলে তাদের এক রিপোর্টে বলে, ''আজ আমাদের এমন এক পুলিশ বাহিনী রয়েছে যার রাজনীতিকরণ এবং রাজনীতিগতভাবে মেরুকরণ ঘটানো হয়েছে। কেননা সে তার প্রভুদের হাতে দাবার বোড়ে হয়ে উঠেছে। এর বিনিময়ে পুলিশ কর্মচারীরা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পায় যেটা তাদের টিকে থাকার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে।'' পুলিশ বাহিনীর এই রাজনীতিকরণের সঙ্গে আমরা কিছুমাত্রায় তার সাম্প্রদায়িকীকরণের কথাও যুক্ত করব। অর্থাৎ ঐ রিপোর্ট বলছে, শাসক ও পুলিশ দেওয়া-নেওয়ার এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা। পুলিশকে লাগানো হয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সংকীর্ণ ও জনবিরোধী স্বার্থসিদ্ধির কাজে, বিনিময়ে পুলিশ পায় নিজের স্বার্থ হাসিলের অধিকার। দিন যত এগিয়েছে ব্যবস্থার পচনের প্রক্রিয়া ততই ত্বরান্বিত হয়েছে। অর্থনীতিতে লুণ্ঠনের উপাদানটি ক্রমেই আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত হয়ে ওঠায় রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের প্রক্রিয়াটিও আরও ব্যাপ্ত হয়। ভারতের সংসদ ও বিধানসভাগুলোতে মাফিয়া চরিত্রের সদস্যদের সংখ্যা কম নয়। এদের আড়াল করা ও অপরাধী প্রমাণিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষার ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকাই নির্ধারক হয়ে ওঠে। অপরাধী রাজনীতিবিদ ও পুলিশের এই গাঁটছড়া পুলিশকে তার দুষ্কর্মে শুধু সাহসই জোগায় না, তার অপরাধে অবাধ ছাড়পত্রও দেয়। পশ্চিমবাংলার দোরগোড়াতেই কয়লা চোরা চালানের যে মাফিয়া রাজ দশক দশক ধরে চলছে, পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া তা চলা সম্ভব বলে কি কেউ ভাবতে পারবেন? মাদক পাচার, দেশের সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান, গাড়ি চুরির চক্রও কি পুলিশের অজ্ঞাতসারে চলতে পারে? অপরাধের অন্ধকার জগতের যে দমন ও নিয়ন্ত্রণই পুলিশের কাজ ছিল, তার সাথে একাকার হয়ে ওঠে তাকে রক্ষা করতে ও টিকিয়ে রাখতেই তারা এখন সক্রিয়। সর্বভারতীয় এই ধারা থেকে পশ্চিমবাংলাও কোন ব্যতিক্রম নয়। বামফ্রন্ট জমানায় সি পি এম ক্যাডারদের হুকুম তামিল করে ও তাদের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের রক্ষা করার বিনিময়ে পুলিশ যেমন জনবিরোধী চরিত্র অর্জন করে তাদের কুকর্মকে বাড়িয়ে চলেছিল, আজ তৃণমূল জমানাতেও পুলিশ একইভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ও অপরাধমূলক কাজকর্মের লাইসেন্স পাচ্ছে। ব্যবস্থা পরিচালনায় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সার্বিক অবক্ষয় দ্রুতই সংক্রামিত হয়েছে পুলিশ বাহিনীর মধ্যে। পুলিশের অপরাধমূলক কীর্তিকলাপ ও যথেচ্ছ মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রসঙ্গে অনেকেই পুলিশ বাহিনীর কাঠামো ও কাজকর্মে সংস্কার সাধনের কথা বলেন। কিন্তু যে রাষ্ট্রের হাতে এই সংস্কারের ভার তার সংস্কারই যে সর্বাগ্রে জরুরী। - **জয়দীপ মিত্র**

গণেশ পাইন ...

তিনের পাতার পর

ছেলেমানুষিকেও মহৎ শিল্পকর্ম বলতে চান, গলা ভারী করে চোখমুখ খেলিয়ে হাত বেজায় নাড়িয়ে সেই ছেলেমানুষির ভেতরে তত্ত্ব খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন, তাঁদের যখন দেখি গণেশ পাইনের ছবি নিয়ে টিভি-তে বলছেন বা কলম ধরছেন, খারাপ লাগে। উপায় নেই। সহ্য করে যেতে হয়। আসলে গণেশ পাইনকে বুঝতে এবার অনেক মানুষকে সমবেত হতে হবে, যাঁরা অতীতে তাঁর কাছ থেকে প্রচ্ছদ নিয়েছেন, ইলাস্ট্রেশন নিয়েছেন, সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁর শিল্পচিন্তার কথা শুনেছেন। গণেশ পাইনের সে-সব কাজের রেকর্ড তৈরি হওয়া দরকার। শিল্পীর বিবর্তন বোঝার জন্য। এই মানুষটির মহৎ হৃদয়ের ছবিটি তুলে ধরার জন্য অন্তরঙ্গ কথোপকথনগুলো উচ্চারিত হওয়া খুব প্রয়োজন। দরকার তাঁর বন্ধুদের এগিয়ে আসা, যাঁরা কলেজ স্ট্রীট 'বসন্ত কেবিন'-এ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া 'বসন্ত কেবিন'-এ ধর্মতলার সোডা ফাউন্টেন-এ মন্দার মল্লিকের স্টুডিয়োয়, কবিরাজ রো-র বাড়িতে ও অন্যত্র তাঁর সঙ্গে দিনের পর দিন কথা বলেছেন, তাঁরা এবার গণেশদার কথা বলুন। গণেশ পাইন মানে শুধু লাখ লাখ টাকার হিসেব নয়, নয় এক নম্বর কি দু নম্বরের ঘোড়দৌড়, ছবির বাজারে কে সচিন—গণেশ পাইন না বিকাশ ভট্টাচার্য—এইসব বিচার মিডিয়ার। যদি কারও বিচার বলতে আপত্তি হয়, বদলে দেবেন। মিডিয়া গণেশ পাইনকে এভাবেই তুলে ধরেছিল নিজেদের স্বার্থে। ছবির অপ্রত্যাশিত দাম তো আর্থিক কেলেঙ্কারির কালো টাকার খেলা। শিল্পীরা তার লাভ পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু সেই দামে তাঁদের হাত ছিল না। তাহলে আজ ছবির বাজার যে ভীষণ খারাপ, শিল্পীরা তুলতে পারছেন না কেন?

এতদিন যা হয়েছে, তা খণ্ডিত গণেশ পাইনের মূল্যায়ন। তিনি প্রয়াত হলেন ১২ মার্চ ২০১৩। এই মহৎপ্রাণ মানুষ ও শিল্পীর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নই হতে পারে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা। - **মধুময় পাল**

বিভাস বোস ... *তিনের পাতার পর*

যাওয়ার অঙ্গীকার করেন, আর এ ভাবেই প্রয়াত কমরেডের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার কথা বলেন। সবশেষে গণসঙ্গীতকার নীতীশ রায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ''আন্তর্জাতিক'' সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে স্মরণসভার পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়।

প্রসঙ্গত সবিশেষ উল্লেখ্য, গত ১৩ মার্চ মৌলালী অঞ্চলের বি এম পি ই ইউ সভাঘরে (জর্জ ভবন) সি পি আই (এম এল) কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড বিভাস বোসের স্মরণসভা আয়োজিত হয়েছিল। কমরেড বুড়োদা উপরোক্ত কমিটিরও সদস্য ছিলেন। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক ধীরেশ গোস্বামী সহ জেলা কমিটির সদস্য দিবাকর ভট্টাচার্য, অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী, ইন্দ্রাণী দত্ত প্রমুখ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পার্টির রাজ্য কমিটি সদস্য অতনু চক্রবর্তী।

কমরেড বিভাস বোস লাল সেলাম।

সি পি আই (এম এল) লিবারেশন নবম পার্টি কংগ্রেসের শ্লোগান

১। রাজনীতি আর বৃহৎ পুঁজির অশুভ আঁতাত ধ্বংস করুন, শক্তিশালী করে তুলুন জনগণের রাজনীতিকে!

২। আমেরিকা ও বৃহৎ কর্পোরেট ঘরানার স্বার্থবাহী নীতিসমূহ প্রত্যাখ্যান করুন, দেশ ও জনগণের কল্যাণকর নীতির জন্য সংগ্রাম করুন!

৩। কর্পোরেট লুণ্ঠন থেকে প্রকৃতি ও তার সম্পদকে রক্ষা করুন, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করুন!

৪। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এবং গণতন্ত্রের ওপর কর্পোরেট কব্জা প্রতিহত করুন—দেশকে বাঁচান, মানুষের অধিকার উর্ধ্বে তুলে ধরুন!

৫। জমি, জীবিকা ও স্বাধীনতার ওপর আক্রমণের মোকাবিলা করুন—গণতন্ত্র ও মানুষের মর্যাদা রক্ষা করুন!

৬। সামন্ততান্ত্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক হামলা প্রতিহত করুন—মহিলা ও দলিতদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করুন!

৭। সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং সন্ত্রাস মোকাবিলার নামে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন প্রতিহত করুন—সাম্প্রদায়িক নরঘাতকদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হোন!

৮। অপারেশন গ্রীণ হান্টের নামে আদিবাসীদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন! আদিবাসীদের জমি, জঙ্গল ও আত্মপরিচয়ের অধিকার উর্ধ্বে তুলে ধরুন!

৯। জনগণের আন্দোলন তীব্রতর করতে সি পি আই (এম এল)-কে শক্তিশালী করুন, সংগ্রামী বাম বিকল্প গড়তে গণসংগ্রামের শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন!

১০। কংগ্রেস ও বিজেপি-র বিরুদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তুলুন! সি পি আই (এম এল)-এর আসন্ন নবম কংগ্রেস সফল করুন! রাঁচী, ২-৬ এপ্রিল ২০১৩

চাষি মরছে দাম না পেয়ে সরকার চলছে মুশকিল আসানের গান গেয়ে

তৃণমূলের গত বিধানসভা নির্বাচনী ইস্তাহারের পাতা উল্টে আবার দেখুন। চোখ রাখুন কৃষি পণ্য আর কৃষক নিয়ে প্রতিশ্রুতির কথনগুলোতে। পড়ুন, ধান-চাল সরাসরি কেনা আর ন্যায্য দাম দেওয়া নিয়ে রাখা হয়েছিল কেমন গদগদ প্রতিশ্রুতি। তৃণমূল তখন কৃষিজমির প্রশ্নে পুঁজি আর দালাল সরকারের হামলার বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের ফসল থেকে দলের ঘরে ভাবমূর্তির পুঁজি তুলে বাড়ছিল টগবগিয়ে। তখন চোখ-কান খুলছিল, বোধ হচ্ছিল, ক্ষমতায় আনলে আনতে পারে সবচেয়ে সংখ্যাবহুল কৃষকরাই। সুযোগসন্ধানী সুবিধাবাদী বামেরা তিন দশক আগে ক্ষমতায় এসেছিল যে প্রধান সামাজিক শক্তির সমর্থনের সূত্রে, অধঃপতিত বামেদের পতনও অনিবার্য হচ্ছিল মূলত সেই একই শ্রেণীশক্তির আস্থা টলে যাওয়ায়। সেই পড়ে পাওয়া শিক্ষা মোতাবেক তৃণমূল তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে কৃষি আর কৃষকের মন পেতে বিশেষ সাধন-ভজন শুনিয়েছিল। কিছু কথা ফের আয়নার মতন উদ্ধৃত করা যায়। ''গ্রামীণ অর্থনীতিকে উৎসাহ জোগাতে এবং আরও বেশি পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষকদের সঠিক দাম দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ধান এবং আলু উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের জমির উর্বরতা বজায় রাখতে হবে, যেন ধান এবং আলুর মজুত বৃদ্ধি পায়; বারো মাস তার জোগান ঠিক থাকে, কৃষক তার ন্যায্য পাওনা পায়। তাহলে কৃষকদের মধ্যে অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটবে না।'' (নির্বাচনী ইস্তাহার, তৃণমূল কংগ্রেস, বিধানসভা নির্বাচন ২০১১)। এই সাদা কথাগুলোর মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কাদামনের তল দেখিয়ে দেওয়া তখন সম্ভবই ছিল না। কেননা, তখন তৃণমূলের ক্ষমতাসীন আচরণের পরিচয় পাওয়াটা অনেক অপেক্ষা করার ব্যাপার ছিল।

তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় এল কংগ্রেসের সাথে জোট করে। জোটের সরকারের ডাক নাম হল মমতা সরকার। তারপর তিনি একশ দিন অন্তর নিজেই একশ শতাংশ নম্বর দেওয়া 'কীর্তি' স্থাপনের নথী প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু তাতে কৃষি ও কৃষক প্রশ্নে দেওয়া উপরোক্ত প্রতিশ্রুতির ফলাফল কোনও গুরুত্ব পেল না। কৃষিজমির শিল্পদ্যোগী কেনাবেচায় সরকার মধ্যস্থ থাকবে না, যে প্রতিশ্রুতি এই সরকারের জীবনবীমার প্রিমিয়াম, শুধু এই 'প্রতিশ্রুতি' বজায় রেখে কৃষিপণ্যের বিক্রিবাট্টা ও সহায়ক দামের প্রশ্নে সরকার গয়ংগচ্ছভাব নিয়ে চলতে থাকল। এই অবহেলা গতবছর খরিফ মরশুমের চাষ ওঠার পর থেকেই সংবাদ জগতের খবর হতে থাকে। বামফ্রন্ট আমলের মতই, দেশের চারপ্রান্তের অন্যান্য রাজ্যের মতই, খবর বাড়তে থাকে ফসলের অভাবী বিক্রীর, কম দামে বেচেও মাসের পর মাস বকেয়া দাম না পাওয়ার, ঋণ ফাঁসে জড়িয়ে যাওয়ার, আর কৃষক আত্মহত্যার। অন্যদিকে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা পরিস্থিতির এই সংকট কোনমতেই মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে, উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই, সবই হয় ছোট্ট ঘটনা, নয়তো মিথ্যা রটনা। সরকার ঝাঁপিয়ে পড়ে সবকিছু দেখছে, করছে। কোথাও কৃষক আত্মহত্যা করে থাকলে তার কারণ আর যাই হোক, কৃষির সংকটে নেই! কারণ, নতুন সরকার আসার পর কৃষিতে আর সংকটই নেই! মুখ্যমন্ত্রী থেকে খাদ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী—সকলেরই মুখে একই মন্তব্য। আসলে, দলের ইস্তাহারে, সরকারি ঘোষণায় অনেক বড় বড় কথা দেওয়া হয়, মধু এবং ঝাঁঝ দুটোই থাকে। কিন্তু সময়ের ধারায় হাতেনাতেই প্রমাণ মিলতে থাকে। শ্রেণী-দোষ যাবে কোথায়! শ্রেণীচরিত্র লুকোবে কতদিন! তা ইতিমধ্যেই উন্মোচিত হতে শুরু করেছে।

মমতা সরকার গত অক্টোবরের প্রথমার্ধে ঘোষণা করেছিল ২০১২-১৩ বর্ষের জন্য চাষিদের থেকে সরাসরি ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪ লক্ষ টন। আর, চাষিরা যাতে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পায় সেটা নিশ্চিত করা হবে। চাষিদের ঘরে ঘরে তখন মজুত ধান, বিক্রীর জন্য অধীর অপেক্ষায়। ধান বিক্রী না হলে উপায়ান্তর নেই। ঋণ শোধ আর ভরণপোষণের চিন্তায় প্রতিটি চাষি পরিবারের মাথায় হাত। সরকার যত বড় গলায় ঘোষণা করল, তৎপরতা কিন্তু তখনই শুরু করল না। উপর্যুপরি সদম্ভ ঘোষণা শোনা গেল খাদ্যমন্ত্রীর মুখে। সংগ্রহের পরিবর্দ্ধিত লক্ষ্যমাত্রা থাকবে ২২ লক্ষ টন, চাষিদের থেকে সরাসরি যা কেনার তা বাদে চালকলগুলো থেকে চাল কেনার লক্ষ্যমাত্রা ৮ লক্ষ টন। সংগ্রহ শুরু না হতেই তার লক্ষ্যমাত্রায় 'কৃষক আর চাল মালিক'—এই পরস্পর বিপরীত শ্রেণীবিভাজন ছকে নেওয়া হল। প্রথমোক্ত শ্রেণীটি যেখানে অভাবী, সঙ্গতিহীন, সেখানে শেষোক্ত শ্রেণীটি প্রতিপত্তিশালী এবং বহুক্ষেত্রেই কৃষকদের অভাবী বিক্রীতে বাধ্য করতে, শোষণ ও নির্মমতায় কুলাক শ্রেণীচরিত্রেরই। এমনকি কৃষকদের দাম দেওয়ার প্রশ্নে ক্ষমতার দাপটে দীর্ঘ অপেক্ষায় ফেলে রাখে। আর, এই চালকল মালিকশ্রেণীর সাথে মমতা সরকারের প্রথম থেকেই কারবারের আঁতাতে মেতে ওঠার পদক্ষেপ ছিল স্পষ্ট। ধানের কুইন্টাল প্রতি সরকারি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল ২০১১-১২-য় ১০৮০ টাকা, ২০১২-১৩-য় ১২৫০ টাকা। এটা ছিল কেন্দ্রীয় ঘোষণা। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আরও ১০০ টাকা কুইন্টাল প্রতি বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করবেন। কেন্দ্রকে 'এক হাত দেখে নেবেন' নয়। কেননা, তখন চলছিল কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেসের সাথে তৃণমূলের মধুচন্দ্রিমার পর্ব। আর, তৃণমূলের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনের দৌড়ে যেভাবেই হোক, বুলিতে-ঝুলিতে এগিয়ে থাকা। তাই কেন্দ্রকে অনুরোধ-উপরোধ করা ছাড়াও মমতা সরকার ধান-চাল কিনতে নাবার্ড থেকে ৩০০ কোটি টাকা ঋণও নিয়েছিল। কথা ছিল, সেই টাকা নাবার্ড দেবে 'বেনফেড', 'কনফেড', 'এসেনশিয়াল কমোডিটিস্ সাপ্লাই কর্পোরেশন' (ই সি এস সি)-কে। আর সেই টাকায় ঐ তিন সংস্থা চাষিদের থেকে ধান কিনবে। সংগ্রহ শুরু হওয়ার কথা ছিল গত নভেম্বর থেকে। তারপরে এফ ডি আই ইস্যুতে কংগ্রেস-তৃণমূল মিতালী ভেঙ্গে যায়। ইতিমধ্যে সাড়ে চার মাস অতিক্রান্ত, মমতা সরকার আজও স্বচ্ছ হিসাব দিচ্ছে না কত মূল্যে কত ধান কিনেছে, কত ধান কিনতে কত তেল পুড়েছে, আর কত ধানে মিলেছে কত চাল। খাদ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, গত নভেম্বরেই চাষিদের ধান বিক্রীর মুশকিল আসান করে দেবেন। অথচ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত চিত্রটা ছিল যথেষ্ট প্রবঞ্চনার। এরপর এ বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত ধান-চাল কেনার হিসাব পরিষ্কার নয়। কিন্তু চালকল মালিকরা চাষিদের পাওনা নিয়ে ব্যাপক প্রতারণা চালাচ্ছে।

রাজ্যের ২০ লক্ষ কৃষকের কিষাণ কার্ড এখনও মেলেনি, ব্লকগুলোতে অন্যান্য কৃষিপণ্যের বেচাকেনার 'কিষাণমাণ্ডি'র ঘর নির্মীত হয়ে চললেও সরকারের পরিচালনায় সেসব পণ্য কিনবে কোন্ প্রতিষ্ঠান—সেই ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। কোনও দায়িত্বপূর্ণ প্রচার-পরিকল্পনা নেই, পঞ্চায়েতে কোন স্পষ্ট নির্দেশিকা নেই, কৃষিদপ্তর দেখাচ্ছে কৃষি বিপণন দপ্তরকে, উত্তর জানা নেই স্বনির্ভর গোষ্ঠী দপ্তরের। আর এখন তো নতুন আলুর দামেও চাষি আবার সেই মার খাচ্ছে। মমতা সরকারের ভণ্ডামীর আরেক ছল হল, কেবল কেন্দ্রের দোষ দেখিয়ে নিজের দোষ ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা। বস্তুত, কেন্দ্রের মজুত খাদ্যশস্য পচে খোলা মাঠে, তবু সমস্ত গরিবের সেই খাদ্যশস্য জোটে না। রাজ্যেও সরকারের টালবাহানা ও প্রতারণার পরিণামে চাষির ধান-আলু ঘরে-মাঠে পচছে, আর চাষি সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

সরকারের ঘরে ধান বেচে মাসের পর মাস টাকা না পাওয়ার তথ্য প্রকাশ হতে শুরু করে গত অক্টোবর থেকেই। ধান উৎপাদনে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা বর্ধমান জেলাতেই এই অভিজ্ঞতা বড়ই শোচনীয়। মন্তেশ্বর ব্লকের ২১টি গ্রামের প্রায় ১৫০ চাষি তখনও ছয়মাস আগে বেচা ধানের দাম পাননি। তারা ধান দিয়েছিলেন এক সমবায় সমিতির কাছে। স্থানীয় জামনা সমবায় সমিতির কাছ চাষিদের ধান বিক্রীর টাকা পাওনা ছিল ৫১ লক্ষ টাকা। সমিতির বক্তব্য ই সি এস সি টাকা দেয়নি, তাই চাষিদের দেওয়া যায়নি। খোদ খাদ্যমন্ত্রীর জন্মভিটে মন্তেশ্বরেই। তিনি দুঃখপ্রকাশ করেই পাশ কাটিয়েছেন, স্বীকার করেছেন টাকার অভাবে ওখানে ৫,৪০০ কুইন্টাল ধানের দাম সময়মতো দেওয়া সম্ভব হয়নি। টাকা না পাওয়ার একই বঞ্চনার অভিজ্ঞতা হয়েছে ব্লকের বরণডালা গ্রামের হারাধন কর্মকারদের। ৫৭০টি চাষি পরিবারের মধ্যে মাত্র ১৩১টি পরিবার ধান বিক্রীর চেক পেয়েছেন। মন্তেশ্বরের বিডিও শুধু অসহায়তা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের জেলা কন্ট্রোলারও ই সি এস সি-র দ্বারস্থ হবেন শুনিয়ে দায়িত্ব সেরেছিলেন। মন্তেশ্বরের আরও একটি সমবায়—কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির ভাষ্যও ছিল একই, ই সি এস সি মাত্র ৩২ লক্ষ টাকা দেওয়ায় ১৮৬টি চাষি পরিবারকে ধান বিক্রীর টাকা দেওয়া হয়নি ছয়-সাত মাস যাবত। ফলে, কৃষকের আত্মহত্যা থেকে জঙ্গী বিক্ষোভ সবই ঘটেছে। তবু সরকারের পলিসিতে কোনও পরিবর্তন আসেনি। পাশাপাশি চালকল মালিকরা লক্ষ লক্ষ টাকা বকেয়া রেখে চাষিদের নাজেহাল করে মারছে। সম্প্রতি এরকম বর্ধমানের ৪টি ও বাঁকুড়ার ১টি চালকলের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ বকেয়া রাখার অভিযোগে সি আই ডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ৫টি চালকল মালিকের কাছে কৃষকদের পাওনা মোট ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৬০ টাকা। চাষি আর চালকল মালিকদের মধ্যে ধান বেচা-কেনা হয়েছে ভায়া বেনফেড-কনফেড-সি এম আর এজেন্সী ও স্থানীয় সমবায়ের মাধ্যমে। চাষি যেমন দাম পায়নি, সরকারের ঘরেও চাল ঢোকেনি। তাছাড়া, অনেক চালকল মালিকের দেওয়া চেক বাউন্সও করছে, অনেক চালকল মালিক লেভীর চাল দিচ্ছে না। সবই ঘটছে সরকারের নাকের ডগায়, অথচ সরকারের বিশেষ হেলদোল নেই। কৃষক যখন ক্ষোভ-বিক্ষোভে ফেটে পড়ার মুখে, তখন কোথাও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে চাষির পাওনা মেটানো হচ্ছে, কোথাও পুলিশী তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই সবই ব্যাপক আকার ধারণ করা সমস্যার তুলনায় নেহাতই সামান্য কিছু পদক্ষেপ মাত্র। পুঁজির ক্ষমতাধর প্রতিপত্তিশালী যে চালকল মালিকশ্রেণী, তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পলিসির কোন নাম গন্ধ নেই।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা

কুচবিহারে বাদুড়বাগান এলাকায় আকুপাংচার সোসাইটি হলে সম্প্রতি ''শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক'' বিষয়ক এক আলোচনা সভা হয় গত ১৭ মার্চ। বক্তব্য রাখেন শঙ্কর নারায়ণ দাস, ধীরেশ দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ, উপস্থিত ছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে কুচবিহারের বিখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিনায়ক রায়। বক্তারা শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা, বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নত করার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। ঐ আলোচনা সভার আয়োজক ছিল যুক্তভাবে এ আই এস এ, কুচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, কুচবিহার মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ও সুশ্রুত আকুপাংচার সোসাইটি।

বি এস এফের গুলিতে কৃষক হত্যা

কুচবিহার জেলার দিনহাটা ব্লকে সুকারুর কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্তর্ভুক্ত কিসমত কোরলা গ্রামে গরু পাচার করার ভুয়া অভিযোগে স্থানীয় নিরীহ এক কৃষক মজিবর রহমান (৪০)-কে বি এস এফ গুলি চালিয়ে হত্যা করে। তাঁর ভাই গোলাম মোস্তাফা বলেন, মজিবর রহমান সেইসময় মাঠে কাজ করছিলেন। বি এস এফ তাঁর দিকে তাক করে রবারের বুলেট মারে আর তাতে আহত হয়ে তিনি হাসপাতালে মারা যান। এ আই এস এ-র পক্ষ থেকে এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, নিহত কৃষককের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানানো হয়। এ আই এস এ-র এক ছাত্র প্রতিনিধি দল প্রশান্ত রায়ের নেতৃত্বে গত ১২ মার্চ নিহত মজিবর রহমানের বাড়িতে গিয়ে শোকাহত পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন, সমবেদনা জানান।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় তৃতীয় পাতায় ''কান্দীতে আইসা-র প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মসূচী'' শিরোনামে রিপোর্টে ভুলবশতঃ প্রথম কলমের চতুর্থ-পঞ্চম লাইনে ছাপা হয়েছে ''... মৌলবাদ লড়াইকে ...'', বাক্যটি হবে ''... মৌলবাদ বিরোধী লড়াইকে ...''।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

লোকযুদ্ধ

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ঃ ১৪০ টাকা

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল,
অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

সি পি আই (এম এল) ঃ নবম কংগ্রেসের খসড়া প্রতিবেদন (৮)

জাতীয় পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য

১। ভারত এক উত্তাল সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। একদিকে দেখা যাচ্ছে নয়া-উদারবাদী নীতির জমানার ক্রমবর্ধমান সংকট এবং এই সংকটের বোঝা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কর্পোরেট/রাষ্ট্রের মরিয়া আক্রমণ; অন্যদিকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি জনগণের ক্রোধের বিপুল বহিঃপ্রকাশকে। কর্পোরেট জমি লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে কিম্বা যৌন হিংসার প্রতিবাদে অথবা শ্রমিকদের অধিকারের দাবিতে গড়ে ওঠা সংগ্রামে সর্বত্রই জনগণের আত্মঘোষণার উৎসাহব্যাঞ্জক প্রাবল্য দৃশ্যমান হয়ে চলেছে। ১৬ ডিসেম্বর গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লীতে ঐতিহাসিক যুব অভ্যুত্থান মহিলাদের অধিকার রক্ষায় দেশব্যাপী এক নারী জাগরণের সাথে সাথে সামাজিক জাগৃতির সঞ্চার করেছে। ২০-২১ ফেব্রুয়ারি নজিরবিহীন দু-দিনের সর্বভারতীয় ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর জোরালো এক উত্থানকেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। অর্থনৈতিক দুর্ভোগ ও রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক হামলা সত্ত্বেও বর্তমান সন্ধিক্ষণটি ভারতীয় জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মহৎ সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

২। দুই দশকব্যাপী লাগামহীন উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও ভুবনীকরণের আর্থিক নীতির নিরবচ্ছিন্ন অনুসরণ ভারতকে এক গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই সমস্ত বছরগুলোতে শাসকশ্রেণী তাদের নীতিসমূহের ন্যায্যতা বোঝাতে আর্থিক বিকাশের বর্ধিত হারের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে এসেছে। কিন্তু গত এক দশকে আর্থিক বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন স্থানে নেমে আসায় বিকাশের বেলুনটি চুপসে গেছে। কৃষি এবং শিল্প উৎপাদন গভীর স্থিতাবস্থার মধ্যে পড়েছে এবং বহু প্রশংসিত পরিষেবা ক্ষেত্রটিও মন্দা কবলিত হতে শুরু করেছে।

৩। আমেরিকা ও অন্যান্য সংকট-আক্রান্ত দেশগুলোর অনুকরণে ভারতীয় শাসকশ্রেণী একদিকে সংকটগ্রস্ত কর্পোরেশনগুলোর জন্য বেল-আউট ঘোষণা করা ও অন্যদিকে ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে ও আর্থিক ঘাটতি ঠেকানোর নামে সাধারণ মানুষের ওপর আরও দুর্দশা নামিয়ে আনা—এই দ্বিমুখী কৌশল অবলম্বন করে। দু-দশক আগে মনমোহন সিং ভারতের অর্থনীতিকে উদ্ধার করার নামে নয়া উদারনৈতিক নীতিমালার প্রবর্তন করেন। আর এখন সেই নীতিমালা যখন ভারতকে আরও গভীর পাঁকে নিমজ্জিত করছে তখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিং আরও বেপরোয়াভাবে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও ভুবনীকরণের নয়া উদারবাদী কর্মসূচীকে চাপিয়ে দেওয়ার এক সুযোগ হিসেবে এই সংকটকে কাজে লাগাতে চাইছেন।

৪। বিদেশী পুঁজির ওপর ভারতের নির্ভরতাকে কাটিয়ে তোলার পরিবর্তে এবং বিশ্বপুঁজির আক্রমণ থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রক্ষাকবচ খাড়া করার বদলে ইউ পি এ সরকার অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রকে বিদেশী পুঁজির ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণহীন কার্যকলাপের সামনে বেপরোয়াভাবে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। ব্যাপক বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে সরকার বহু ব্র্যাণ্ডের খুচরো ব্যবসা ও পেনশন তহবিলে এফ ডি আইকে অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২০১২-১৩-র বাজেটেই সর্বপ্রথম ভারত সেই সমস্ত ফাঁক ফোকরগুলো বন্ধ করার জন্য বিধি প্রবর্তনের কথা (জেনারাল অ্যান্টি অ্যাভয়ডান্স রুলস—কর ফাঁকি রোধক সাধারণ আইন) বলে—যেগুলোর মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আইনসিদ্ধভাবে কর এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মরিশাস ও কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের মত কর ছাড়ের স্বর্গরাজ্যকে ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু দ্রুতই সরকার সিদ্ধান্তকে স্থগিত করে দেয়, প্রথমে এক বছর তারপর তিন বছরের জন্য। আর এই বছরের বাজেটকে কার্যত বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে—যেখানে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বিদেশী বিনিয়োগের স্বাগত জানানো ছাড়া দেশের সামনে আর কোন পন্থা নেই।

৫। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কর্পোরেটক্ষেত্রকে ভর্তুকি দেওয়ার ঘটনাগুলো এদেশে নানা রূপে চলে থাকে। বার্ষিক বাজেটগুলোতে কর্পোরেট ক্ষেত্রের জন্য যেভাবে কর ছাড় দেওয়া হয় তা থেকেই এ প্রশ্নে স্পষ্ট ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয় এবং গত আটটি বাজেটে এই ছাড়ের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫ ট্রিলিয়ন টাকায়। এটাও সুবিদিত যে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর সব থেকে বড় ঋণগ্রহীতা হল কর্পোরেট সেক্টর এবং ঋণ পরিশোধ না করার দিক থেকেও এরাই হল সর্ববৃহৎ। বিশ্বজুড়ে লগ্নী সংকট সত্ত্বেও ব্যাঙ্কগুলো তাদের কর্পোরেট মক্কেলদের প্রচুর ঋণ দিয়ে চলেছে এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এই কর্পোরেট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩.৬ ট্রিলিয়ন টাকা।

৬। সাম্প্রতিক সময়ের সব থেকে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারিগুলো যেমন ২-জি, কোলগেট, কে-জি বেসিন কেলেঙ্কারি (কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় গ্যাস ভাণ্ডার ও এন জি সি কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় এবং পরবর্তীতে রিলায়েন্স শিল্প গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়) ইত্যাদিগুলো হল কর্পোরেটদের স্বার্থে জাতীয় কোষাগারের বিপুল আর্থিক ক্ষতির এক একটা উদাহরণ। কর্পোরেট ক্ষেত্রের প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অথবা কর্পোরেট লুণ্ঠনের জন্য রাষ্ট্রের সংযোগ ও সম্মতির নিদর্শন হল সেই সমস্ত নির্লজ্জ কর্পোরেট ঘেঁষা আইন প্রণয়ন, যেমন ২০০৫-এর এস ই জেড আইন, ইউ পি এ মন্ত্রীসভা কর্তৃক অনুমোদিত জমি অধিগ্রহণ বিল ইত্যাদি কিংবা পি পি পি মডেলের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য বর্তমান আইন ও সংসদীয় প্রক্রিয়াগুলোতে ধারাবাহিক অন্তর্ঘাতমূলক পরিবর্তন ঘটানো।

৭। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুর্নীতির বিস্ময়করভাবে বেড়ে ওঠাকে রাষ্ট্র-কর্পোরেট লাগাতার আঁতাতের পরিণাম বা তাদের অঙ্গাঙ্গী বৈশিষ্ট্য হিসেবেই দেখতে হবে। সি এ জি কর্তৃক উন্মোচিত বিশাল বিশাল কেলেঙ্কারিসমূহ দেখিয়ে দেয় যে দুর্নীতি হল প্রকৃতপক্ষে কর্পোরেটদের জন্য ভর্তুকি বা কর্পোরেট লুণ্ঠনেরই বহিঃপ্রকাশ। আর কর্পোরেট লুটের অর্থই হল জাতীয় কোষাগারকে আত্মসাৎ করা এবং দেশের সম্পদকে লুটে নেওয়া ও জনগণের অধিকারগুলো হরণ করা। শাসকশ্রেণীগুলো এবং তাদের তত্ত্বকারেরা যখন এই লুণ্ঠনকে আড়াল করা বা ন্যায়সঙ্গত বলে দেখানোর জন্য উন্নয়নের ছদ্মবেশকে হাজির করে তখন দুনিয়াজুড়ে মার্কসবাদী পণ্ডিত ও গণআন্দোলনের শক্তিসমূহ একে পুঁজিবাদী শোষণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে (জনগণের) লুণ্ঠনমূলক পুঁজি সঞ্চয় বলে যথার্থভাবেই চিহ্নিত করেন—যেখানে মুষ্টিমেয়র হাতে প্রভূত সম্পদ জমা হয় আর জনসমষ্টির বিশাল অংশকে নিঃস্ব ও বঞ্চিত করা হয়।

৮। দুর্নীতির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধিও এক জ্বলন্ত সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে আর এটা সরকারের আর্থিক নীতিমালারই প্রত্যক্ষ পরিণতি। পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বিনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে এবং সম্প্রতি এখন রেল বাজেটেও যাত্রী ভাড়াকে পরিবর্তনশীল জ্বালানির মূল্যের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে বিনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধার মত মৌলিক পরিষেবাগুলোর ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকীকরণের সাথে সাথে সমস্ত বুনিয়াদী সামগ্রী ও পরিষেবার মূল্যবৃদ্ধি শ্রমজীবী জনগণের ক্রয়ক্ষমতার ক্রমাগত হ্রাস ঘটিয়ে চলেছে—যার ফলে জনগণ বেশী বেশী করে দারিদ্র্য ও অনাহারের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছেন। মূল্যবৃদ্ধিকে প্রতিহত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও গরিবদের জন্য কিছু পরিমাণে কার্যকরী ভর্তুকি প্রদানের পরিবর্তে সরকার মনভোলানো কিছু পরিসংখ্যান হাজির করছে এবং এমনকি হাস্যকরভাবে দারিদ্র্যসীমাকেই নামিয়ে আনছে। আর এখন সে ভর্তুকি আরও ছাঁটাইয়ের সুপারিশ করছে এবং আরও অল্পসংখ্যক উপভোক্তার কাছে নগদ অর্থে ভর্তুকি দেওয়ার প্রস্তাব করছে—যার ফলে খেটে খাওয়া মানুষের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বাজারের দয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

৯। কর্পোরেট-বাজার হামলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গণতান্ত্রিক পরিসরকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করে তোলা। কর্পোরেট লুণ্ঠনকে যেমন উন্নয়নের নামে আড়াল করার চেষ্টা হয়ে থাকে, তেমনি গণতন্ত্রের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণকে জাতীয় নিরাপত্তার নামে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। ভারতীয় রাষ্ট্রের বর্তমান এই জাতীয় নিরাপত্তার তত্ত্ব আসলে 'জাতীয় নিরাপত্তা'র নামে সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য কায়েমের লক্ষ্যে আমেরিকার যে তত্ত্ব তার এবং 'সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধ'-এর নামে আমেরিকার মুসলিম বিরোধিতার প্রসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতীয় রাষ্ট্র আমেরিকার এই পক্ষপাত ও অগ্রাধিকারগুলোকে দেশের মাটিতে টেনে আনছে এবং একে পাকিস্তান ও চীনের সাথে ভারতের নিজস্ব চিরায়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বন্দুকের ডগায় চালিত করার ও দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে মাওবাদীদের সব থেকে বড় বিপদ বলে ভাবার যে অভ্যাস তার সঙ্গে যুক্ত করছে। সন্ত্রাসবাদ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস—একে অপরকে শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে এটি বর্তমানে এক স্বয়ংক্রিয় অবিরাম ক্রিয়াশীল চক্রে পরিণত হয়েছে।

১০। 'কঠোর রাষ্ট্রের' তত্ত্ব হল আসলে বেসামরিক প্রশাসনে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপকে বেশী বেশী বাড়িয়ে তোলার জন্য ভারতকে পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করার এক নরম ভাষ্য। শাসকশ্রেণীর সমস্ত বড় দলগুলো বিশেষ করে জাতীয় দলগুলোর মধ্যে কংগ্রেস এবং বিজেপি এবং আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে শিবসেনা এই তত্ত্বের শরিক। ক্রমশ বেড়ে ওঠা প্রতিরোধের মুখে 'পোটার' মত দানবীয় আইনকে সরকার প্রত্যাহার করে নিলেও; আফস্পা, ইউ এ পি এ-র মত দানবীয় আইন প্রণয়ন এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদীদের ফেলে যাওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের দ্বারা গণতন্ত্রকে ধারাবাহিকভাবে পদদলিত করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর পছন্দ নয়—এই কারণ দেখিয়ে আফস্পা আইন বাতিল বা অন্ততপক্ষে সংশোধনের জন্য প্রতিটি পরামর্শকে সরকার নাকচ করছে এবং সেনাবাহিনী বলছে, প্রতিহত করতে আফস্পার মত বিশেষ আইনের রক্ষাকবচ ছাড়া নাগরিক অসন্তোষের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। গ্রীণ হান্ট অভিযান ও অনুরূপ দমনমূলক অভিযান চালাতে ও বিনা বিচারে আটক রাখতে ইউ এ পি এ আইনী অস্ত্র যুগিয়েছে এবং রাষ্ট্রদ্রোহ আইন (ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা) অসন্তোষকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হত্যা করতে সুবিধা করে দিয়েছে। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদ বিস্ফোরণের সময় আমেরিকার এন সি টি সি-র ধাঁচে ইউ পি এ সরকার পুনরায় ন্যাশনাল কাউন্টার টেররিজম সেন্টার স্থাপনের ভাবনাকে সামনে আনতে সচেষ্ট হয়েছে। ইউ এ পি এ-র স্বেচ্ছাচারী ধারাগুলোর দ্বারা বলীয়ান হয়ে এই ধরনের সংস্থা গোয়েন্দা বিভাগের (আই বি) হাতে অপরিসীম ক্ষমতা জোগাবে এবং প্রকৃত অর্থে তার আমেরিকান সহযোগী এফ বি আই-কেও মদত জোগাবে এবং কোন স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা ছাড়াই যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও হয়রানি করা সম্ভব হবে। ভারতে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার প্রশ্নটি আজ এই জাতীয় সমস্ত দানবীয় আইন সমূহ ও ক্রমবর্ধমান বিচার বিভাগ বহির্ভূত নিপীড়নমূলক পদক্ষেপগুলোর জরুরী ভিত্তিতে প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে।

১১। ক্রমেই বেড়ে চলা জনগণের বিরোধিতার মুখে কেলেঙ্কারি-কলঙ্কিত ও সবদিক থেকে নিন্দিত ইউ পি এ সরকার বিজেপিকে তোয়াজ করে সঙ্কট থেকে উদ্ধার হতে চাইছে। এর সবথেকে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল আফজল গুরুর ফাঁসি—যা অত্যন্ত সঙ্গোপনে, এমনকি তার পরিবারকে কোন কিছু না জানিয়ে এবং তার ক্ষমতা প্রার্থনার আবেদন খারিজ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথার্থ সুযোগ না দিয়েই সংঘটিত করা হয়েছে। কাশ্মীরের প্রেক্ষাপটে, কাশ্মীরী নেতা মকবুল বাটের প্রাণদণ্ডের ২৯তম বার্ষিকীর মাত্র দু-দিন আগে সংঘটিত অন্যায়ভাবে এই ফাঁসি দেওয়ার ঘটনা কাশ্মীরী জনগণের বিচ্ছিন্নতাবোধকে অপরিমিতভাবে গভীর করে তুলেছে। ভারতীয় রাজনীতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এই জাতীয় তোষণকে কংগ্রেস কর্তৃক বিজেপির অযোধ্যা অভিযানের কাছে আত্মসমর্পণের সাথেই তুলনা করা যায়—যার ফলে সংঘ পরিবারের বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সরে পড়তে সুবিধা হয়।

১২। কংগ্রেস, বিজেপি ও প্রধান সংবাদ মাধ্যমগুলোর দ্বারা আফজল গুরুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর উন্মত্ততা সৃষ্টির তারস্বর প্রচারকে অগ্রাহ্য করে দেশের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক জনমত সাহসের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের অশুভ রাজনৈতিক তাৎপর্যকে উন্মোচিত করেছে। ক্ষুব্ধ কাশ্মীরী জনগণের ক্রোধ ও যন্ত্রণার এই মুহূর্তে আমরা অবশ্যই তাদের পাশে দাঁড়াব এবং গণতন্ত্র ও ন্যায়ের জন্য ও আফস্পা প্রত্যাহারের দাবিতে তাদের সংগ্রামকে সমর্থন জানাব। এই ঘটনা সঠিকভাবেই ভারতে মৃত্যুদণ্ডের অবসান ঘটানোর অথবা অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে অন্ততঃপক্ষে মৃত্যুদণ্ডে স্থগিতাদেশ প্রদানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে প্রস্তাব তাকে মান্যতা প্রদানের দাবিকে জোরদার করে তুলেছে।

১৩। শাসকশ্রেণী দেশকে এক সর্বব্যাপী সংকটের দিকে ঠেলে দেওয়ায় এবং সাধারণ জনগণের জীবিকা ও অধিকারের বিরুদ্ধে কার্যত এক যুদ্ধ ঘোষণা করায় জনগণও সর্বত্র সরকারগুলো ও তাদের নীতিমালার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। এ যাবৎকাল ভারতের ইতিহাসে সর্বাধিক কেলেঙ্কারি-কলঙ্কিত শাসক হিসেবে কংগ্রেস দ্রুতই তার জমি হারাচ্ছে। বিজেপিও সমভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে উন্মোচিত হচ্ছে এবং ফলত কংগ্রেসের যা ক্ষতি তা বিজেপির লাভে হুবহু রূপান্তরিত হচ্ছে না। তথাপি, যে সমস্ত রাজ্যে কোন তৃতীয় শক্তির বড়সড় অস্তিত্ব নেই এবং নির্বাচনী রাজনীতি মূলত কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যেই ঘোরাফেরা করে সেখানে হয় বিজেপি ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে (বিশেষ করে গুজরাটে) অথবা ভাবমূর্তির ক্ষয় হতে থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে (সাম্প্রতিক নির্বাচনে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশে যা দেখা গেছে)।

১৪। কর্ণাটক হল এমন এক রাজ্য যেখানে বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও কংগ্রেস তৃতীয় দল জে ডি (এস)-কে সঙ্কুচিত করে দিয়ে উভয়েই লাভবান হয়েছে। ২০০৪-এ বিজেপি সেখানে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত এবং চার বছর পর, দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটকই হল প্রথম সেই রাজ্য যেখানে বিজেপি সরকার গঠন করে। কিন্তু বিজেপির শাসন ব্যাপক জমি ও খনি কেলেঙ্কারি এবং খনি মাফিয়াদের উত্থান ও মহিলা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশেষত খ্রিষ্টানদের ওপর আক্রমণের জন্য কুখ্যাত হয়ে ওঠে। দুর্নীতির দায়ে কর্ণাটক লোকায়ুক্তের দ্বারা অভিযুক্ত হওয়ায় বিজেপির কঠিন মানব ইয়েদুরাপ্পাকে ২০১১-তে পদত্যাগ করতে হয় এবং পরবর্তীতে পার্টিতে

সাতের পাতায় দেখুন

জাতীয় পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য

ছয়ের পাতার পর

বারংবার বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় তাকে বিজেপি ছাড়তে হয় এবং নিজস্ব দল গঠন করতে হয়। এখন দেখার ইয়েদুরাপ্পাকে বহিষ্কারের ধাক্কা বিজেপি সামলাতে পারে কিনা। অনেক দিন থেকেই, কংগ্রেস শাসিত অন্ধ্রপ্রদেশ যেন আয়নায় প্রতিফলিত বিজেপি শাসিত কর্ণাটকেরই প্রতিচ্ছবি। কাগজে কলমে কংগ্রেস এখনও সেখানে ক্ষমতায় যদিও কংগ্রেস ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা ওয়াই এস আর কংগ্রেসই সেখানকার আসল কংগ্রেস বলে প্রতিভাত হচ্ছে আর চিত্রতারকা চিরঞ্জীবির নেতৃত্বাধীন পূর্বতন প্রজা রাজ্যম পার্টিকে হাত করে নেওয়ার মাধ্যমে কংগ্রেস ক্ষতিপূরণের ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে এবং তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির সঙ্গে মিলে যাওয়ার সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখছে।

১৫। কর্ণাটক ছাড়া অন্য যে রাজ্যে সাম্প্রতিককালে বিজেপি তার শক্তি বৃদ্ধি করতে ও গুরুত্ব আদায় করতে সক্ষম হয়েছে সেটি হল বিহার। প্রকৃতপক্ষে ২০০৫-এর নভেম্বর থেকে ২০১০-এর নভেম্বরের মধ্যে বিহার বিধানসভায় বিজেপি তার শক্তিকে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, আসন সংখ্যা ৫৫ থেকে ৯১-তে বৃদ্ধি ঘটায় ও তার সহযোগী জে ডি (ইউ) থেকে মাত্র ২৪টি কম আসন পায়। আর জে ডি-র অপশাসন যদি বিহারে শক্তি বৃদ্ধি ঘটাতে ও নিজেকে ক্ষমতায় আনতে বিজেপিকে সক্ষম করে তোলে তাহলে নীতীশ কুমারের সঙ্গে জোট গড়ে তোলাটাই তাকে বিহারের বুকে তার সম্প্রসারণ ঘটাতে ও প্রভাবকে শক্তিশালী করতে সবথেকে বড় সহায়তা প্রদান করেছে। নীতীশ কুমার তার ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ধরে রাখার জন্য নরেন্দ্র মোদির থেকে নিজেকে পৃথক দেখানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন কিন্তু বিহারে তার সাম্প্রদায়িক তাস খেলার জন্য বিজেপি খোলা ময়দানই পেয়ে গেছে। ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের রিপোর্টকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে সামন্ত লবির কাছে নীতীশ জমানার সম্পূর্ণ আত্মসর্মপণ এবং রণবীর সেনাকে লাগাতার তোয়াজ করার কারণে বিজেপি আরও সাহসী হয়ে উঠেছে। বিপরীতে, তার চিরায়ত ঘাঁটি যে ঝাড়খণ্ড সেখানে বিজেপিকে তার দল ভেঙ্গে গঠিত ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা ও অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হচ্ছে।

১৬। ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলো উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েকটি দলের যেমন শক্তিশালী আঞ্চলিক বা সামাজিক পরিচিতি রয়েছে বা রাজ্যের দাবি অথবা স্বায়ত্ত শাসনের দীর্ঘকালীন আন্দোলনের মধ্যে তাদের মূল নিহিত রয়েছে, কতকগুলো আবার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কংগ্রেস অথবা বিজেপির ভাঙ্গনের ফলে বা পূর্বতন জনতা দলের ভাঙ্গনের কারণে উদ্ভুত হয়েছে। গত দুই দশকে ব্যাঙের ছাতার মত আঞ্চলিক দলের সৃষ্টি ও শক্তি বৃদ্ধিকে অবশ্যই প্রধানত উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ নীতির জমানায় রাজনৈতিক সংঘাত হিসাবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতে বৃহৎ কর্পোরেট ঘরানা ও বিশ্বপুঁজির শক্ত ঘাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে শক্তিশালী আঞ্চলিক অর্থনৈতিক স্বার্থের উদ্ভব হিসেবে দেখতে হবে। রাজ্যগুলোতে আঞ্চলিক দলসমূহ কংগ্রেস ও বিজেপিকে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেও, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তারা কেন্দ্রের সাথে শক্ত দরকষাকষির মাধ্যমে আঞ্চলিক কিছু সুবিধা আদায়ের বিনিময়ে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। শক্তিশালী আঞ্চলিক দলগুলোর মোকাবিলায় ইউ পি এ সরকার গাজর ও লাঠির কৌশল নিয়ে থাকে এবং সি বি আই-এর মত কেন্দ্রীয় সংস্থা ও রাজ্যের চাহিদার মুখে কেন্দ্রের আর্থিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে থাকে। খুচরো ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগের প্রশ্নে আর একবার আমরা এস পি এবং বি এস পি-কে ইউ পি এ-র ত্রাণকর্তার ভূমিকায় দাঁড়াতে দেখেছি। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় জে ডি (ইউ) ও শিবসেনার মত এন ডি এ শরিকদের কংগ্রেস প্রার্থীর স্বপক্ষে ভোট দিতে দেখেছি।

১৭। সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বাম শিবির তাদের সর্বাধিক শক্তিশালী দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে বড় বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয়েছে। তাদের অপর দুই শক্ত ঘাঁটি কেরল ও ত্রিপুরায় তারা মোটের ওপর শক্তিকে ধরে রাখতে সক্ষম হলেও—কেরলে তারা সামান্য ব্যবধানে হেরে ক্ষমতা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে ও ত্রিপুরায় উপর্যুপরি পঞ্চমবার ক্ষমতায় এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে দলের ক্ষয়ের কারণে জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব যথেষ্টই দুর্বল হয়েছে এবং সি পি আই (এম) ও তার সহযোগীদের শক্তি ২০০১-এ যেখানে ৬০-এর অধিক ছিল তা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়ে ২৪-এ দাঁড়িয়েছে। এ সত্ত্বেও প্রবাদের উটপাখির মত সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গে তার বিপর্যয়কে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, বিপর্যয়ের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান তো দূরস্থল। পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত সকলেই যখন এ জন্য সি পি আই (এম)-এর নয়া-উদারবাদী কর্মসূচীকে আঁকড়ে ধরা ও কার্যকর করা এবং ক্রমাগত ঔদ্ধত্যকে দায়ী করছেন, সি পি আই (এম) তখন এটিকে মুখ্যত ইন্দো-মার্কিন পরমাণু চুক্তির মুখে ইউ পি এ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের বিলম্বিত সিদ্ধান্তের ফলে রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বিন্যাসের পরিণাম হিসেবে বর্ণনা করছে। যদিও সি পি আই (এম) বিরোধী ভূমিকা পালনের জায়গায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে তা সত্ত্বেও দল জাতীয় ক্ষেত্রে ও সবিশেষ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কংগ্রেস সম্পর্কে নরম মনোভাব গ্রহণ করছে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দানের মাধ্যমে তার দীর্ঘদিনের মিত্র সি পি আই এবং আর এস পি-র সঙ্গে সম্পর্ককে ভাঙ্গার পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

১৮। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর নিদারুণ পরাজয়ে বুর্জোয়া চিন্তাবিদ ও কর্পোরেট সংবাদ মাধ্যম বাম বিরোধী প্রচারকে বাড়িয়ে তুলতে উৎসাহবোধ করছে। এটি বাম শিবিরের অভ্যন্তরেও যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করেছে ও নতুন করে ভাবার ক্ষেত্রে সাহস জুগিয়েছে যদিও সরকারিভাবে সি পি আই (এম) আত্মানুসন্ধানে ও কোনরকম শিক্ষা গ্রহণে রাজী নয়। বাম বিরোধী প্রচারাভিযান মোকাবিলা এবং তৃণমূল শাসনে বাম কর্মীবাহিনী ও নেতৃত্বের ওপর নামিয়ে আনা শারীরিক নিগ্রহ এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরোধিতা করার সাথে সাথে আমাদের অবশ্যই সি পি আই (এম)-এর সুবিধাবাদী লাইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা—কেরলে প্রাক্তন সি পি আই (এম) কর্মী ও বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টির কমরেড টি পি চন্দ্রশেখরণকে হত্যা ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রণব মুখার্জীকে সমর্থন জানানো—সি পি আই (এম) নেতৃত্বের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জোরদার করার দাবি জানাচ্ছে। ঘটনাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ মাওবাদীদের দেউলিয়াপনাকেও উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে—যারা তৃণমূলের ক্ষমতায় আসার প্রচেষ্টায় নিজেদের ব্যবহৃত হতে দিয়ে নিষ্ঠুর পরিণাম ভোগ করছেন। ক্ষমতায় আসার আগে মমতা ব্যানার্জী অন্ধ্রপ্রদেশে মাওবাদী নেতা আজাদ হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছিলেন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর এখন তাঁর সরকার মাওবাদী নেতা কিষেনজীকে একই কায়দায় হত্যা করেছে এবং কারাগারে যন্ত্রণাবিদ্ধ প্রায় ৫০০ রাজনৈতিক বন্দির কাউকেই মুক্তি দিতে অস্বীকার করছে। সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ সংগ্রাম এবং তৃণমূলের জনমোহিনী মুখোশের আড়ালে তার ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলাই হল পশ্চিমবঙ্গে বাম আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের চাবিকাঠি।

১৯। লোকসভা নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আমরা বিজেপির মধ্যে নরেন্দ্র মোদীকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তুলে ধরার তীব্র শোরগোল প্রত্যক্ষ করছি। মোদী কর্পোরেট মহলেরও যথেষ্ট প্রিয়পাত্র—যারা বাধাহীন কর্পোরেট স্বাধীনতার গুজরাট মডেলকে এক সর্বভারতীয় স্তরে স্থান করে নেওয়ার জন্য আশাবাদী। অপরদিকে কংগ্রেস এক মোদী বিরোধী বিরাট মেরুকরণ থেকে ফায়দা তুলতে আশাবাদী এবং প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে মোদীকে তুলে ধরার প্রকল্প থেকে এন ডি এ-র মধ্যে ভাঙ্গনের জন্য অপেক্ষারত—যার ফল হিসেবে তারা প্রথম ইউ পি এ সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মিত্রদের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিও হিসেবে রাখে।

২০। আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে মোদির স্বপক্ষে প্রচারের বিরোধিতা করার সাথে সাথে সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে যে মোদি আজ আর শুধুমাত্র আগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক নয়, সে এক পুলিশী রাজ্যে বল্গাহীন কর্পোরেট শাসনেরও প্রতিভূ। বাস্তবে, মার্কিন পরিচালিত ইসলাম বিরোধী অভিযানের কালে সাম্প্রদায়িকতাবাদ নিজেই এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ আসলে কোনদিনই ভারতে মুসলিমদের মন থেকে মুছে যায়নি এবং ১৯৮০-র দশকে সংঘ পরিবার কর্তৃক রাম জন্মভূমির নামে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সমাবেশিত করার মারমুখী অভিযান চালানোর সময় যা দারুণ তীব্রতা লাভ করে তা এখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র মদতপুষ্ট ধরপাকড় অভিযানের দ্বারা নতুন করে শক্তিলাভ করেছে। মোদীর নেতৃত্বাধীন গুজরাট ২০০২-তে কেবলমাত্র যে ভয়াবহ গণহত্যাকেই প্রত্যক্ষ করেছে তাই নয়, সেখানে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার নামে সংঘর্ষে মৃত্যুর বহু ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সংগ্রামকে যে গণতন্ত্রের জন্য বৃহত্তর সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলতে হবে—এই সত্যকে উপলব্ধি করাটা তাই এখন আগের যে কোন সময়ের থেকে আরও জরুরী হয়ে পড়েছে।

২১। একবার যদি আমরা স্বীকার করি যে মোদির ক্ষমতা নিছক সংঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে উদ্ভূত নয় পরন্তু সেটা কর্পোরেট জগতের লাগামছাড়া ক্ষমতা ও লুণ্ঠনের যে ক্ষুধা তা থেকে উৎসারিত তাহলে এটা বোঝা সম্ভব যে মোদী মডেলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেবল সাম্প্রদায়িক বনাম ধর্মনিরপেক্ষ—এই চৌহদ্দির মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে না, বরং তাকে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সমগ্র প্রেক্ষিত ও শ্রমজীবী মানুষের কর্পোরেট বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে শক্তি আহরণ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, কর্পোরেট পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সন্ত্রাস প্রশ্নে মুসলিমদের অপরাধী বানানোর যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—তার বিরোধিতা, এককথায় মোদী মার্কা রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য সমস্ত বিষয়গুলোকে ঘিরে লড়াই চালিয়েই মোদী মডেলের কার্যকরীভাবে মোকাবিলা করতে হবে। কেবলমাত্র জনগণের উচ্চমাত্রার সক্রিয়তা এবং বাম ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তর বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপই দেশকে কর্পোরেট-ফ্যাসিবাদীদের দ্বারা কব্জা হয়ে যাওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

২২। কর্পোরেট-ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে প্রতিহত করা এবং কংগ্রেস ও বিজেপির বিরোধিতার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তব্যটিকে রাষ্ট্র-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যবস্তু ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে অবশ্যই সমন্বিত করতে হবে এবং বিভিন্ন রাজ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিস্থিতি ও নির্দিষ্ট বাস্তবতার ভিত্তিতে নির্বাহ করতে হবে। অধিকাংশ রাজ্য সরকারই হয় বিজেপি/এন ডি এ অথবা কংগ্রেস/ইউ পি এ জোট দ্বারা পরিচালিত—যে দুই জোট জাতীয়ক্ষেত্রে আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকছে। বেশীরভাগ রাজ্য সরকারই এই দুই জোটের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় এমন সব দলদ্বারা চালিত—উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল, উড়িষ্যায় বিজেডি, উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি বা তামিলনাড়ুতে এ আই এ ডি এম কে—যাদের একইরকম জনবিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী ভূমিকা রয়েছে এবং আমাদের অবশ্যই সেগুলোর জোরদার বিরোধিতা করতে হবে।

২৩। জনবিরোধী, কর্পোরেটমুখী সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা নীতিসমূহের বিরোধিতায় গণআন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রামকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক নিপীড়ন ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতন ও সামন্ত/পিতৃতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে প্রতিহত করতে অন্যান্য সংগ্রামী শক্তির সাথে লড়াকু ঐক্যকে আমাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে সারা ভারত বাম সমন্বয় গঠন এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী পদক্ষেপ। কর্মসূচীগত ও কৌশলগত বিতর্ক চালিয়ে, পারস্পরিক সহমতের ওপর আধারিত কর্মসূচী নিয়ে ও সাধারণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী/দিশা ও কৌশলগত বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এ আই এল সি বিভিন্ন বাম সংগঠনকে একত্রিত করেছে—যেগুলোর মধ্যে সি পি আই (এম) থেকে বেরিয়ে আসা সংগঠনগুলোও রয়েছে। এ আই এল সি-কে শক্তিশালী করার সাথে সাথে আমাদের অবশ্যই অন্যান্য বাম শক্তিগুলোর কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টাকেও অব্যাহত রাখতে হবে এবং তাদের সাথে রাজনৈতিক সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সম্ভাবনাগুলোকে অনুসন্ধান করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) বিরোধীপক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করায়, সাথে সাথে জাতীয় রাজনীতিতেও বিরোধী পক্ষ হওয়ায় বস্তুগতভাবে ইস্যুভিত্তিক ব্যাপকতর বাম ঐক্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর নতুন করে ঘনিষ্ঠতা—বিশেষত সাম্প্রতিক কংগ্রেস-তৃণমূল ভাঙ্গনের পর্যায়ে এবং বাম ঐক্যের থেকেও বুর্জোয়া দলগুলোর সঙ্গে সি পি আই (এম)/সি পি আই-এর নৈকট্য গড়ে তোলার অভ্যাস এ প্রশ্নে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে থাকছে।

২৪। প্রায় সমস্ত বুর্জোয়া দল এবং সরকারগুলো যখন নীতির প্রশ্নে কার্যত সহমত পোষণ করছে তখন বেশ একপ্রস্থ বিষয়ে গণপ্রতিবাদগুলো যেভাবে শক্তি সঞ্চয় করছে তা যথেষ্ট উৎসাহজনক। সাম্প্রতিক বিভিন্ন আন্দোলনে—যেমন উড়িষ্যার পসকোর জন্য জমি অধিগ্রহণ বিরোধী সংগ্রাম, জইতাপুর ও কুড়ামকুলামে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তামিলনাড়ুর পরমাকুড়িতে পুলিশের গুলি চালনার বিরুদ্ধে আন্দোলন—যে গুলি চালনায় ৭ দলিত শ্রমিক নিহত হন ও বিহারে বাথানিটোলা গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের (আদালত কর্তৃক) রেহাই দেওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলন এবং গুরগাঁওয়ে মারুতি শ্রমিকদের সংগ্রাম দেশজুড়ে গণতান্ত্রিক বিবেককে আলোড়িত করেছে। বর্তমান সন্ধিক্ষণে সর্বতোভাবে এই সমস্ত আন্দোলনকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২৫। (পৃথক) রাজ্যের দাবিসমূহের নিষ্পত্তি না হওয়ার ফলেও শক্তিশালী গণআন্দোলনের জন্ম হচ্ছে। তেলেঙ্গানা আন্দোলন ছাত্র-যুবদের বিপুল অংশগ্রহণকে দেখিয়ে দিয়েছে। জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের মুখোমুখি হয়ে ইউ পি এ সরকার দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে—যদিও তারা পুরনো প্রতিশ্রুতিকেই পুনরায় উচ্চারণ করেছে মাত্র। তেলেঙ্গানা রাজ্যের প্রশ্নে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ কমিটির রিপোর্টে সমস্ত পথই খোলা রাখা হয়েছে। বছরের পর বছর পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের পাহাড়াঞ্চলে দুটি রাজ্য গঠনের দাবি অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পূর্বতন দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের বদলে স্বাক্ষরিত গোর্খাল্যাণ্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ত্রিপাক্ষিক চুক্তিও গোর্খা জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি এবং গোর্খা জনগণের পরিচিতির সঙ্কট নিরসনের জন্য

আটের পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঃ প্রতিবাদ রাজ্যে রাজ্যে

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দেশজুড়ে ভার্মা কমিটির সুপারিশকে কার্যকরী করার দাবিতে বিশেষত ধর্ষণ এবং যৌন হিংসার বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী আইনের রূপায়ণের জন্য প্রতিবাদ সংগঠিত হয়।

দিল্লী ঃ বিভিন্ন নারী সংগঠন যৌথভাবে মাণ্ডি হাউস থেকে পার্লামেন্ট স্ট্রীট পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বরের গণধর্ষণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তার ধারাবাহিকতায় মিছিল সমাবেশিত করেন। অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলো যথাক্রমে এ আই ডি ডব্লিউ এ, এ আই পি ডব্লিউ এ, সি ডব্লিউ ডি এস, দলিত মহিলা অধিকার মঞ্চ, ফোর্সেস, জাগরি, জে ডব্লিউ পি, এন এফ আই ডব্লিউ, নিরন্তর, প্রগতিশীল মহিলা সংগঠন, পুরগামী মহিলা সংগঠন, সহেলি, স্বস্তিকা মহিলা সমিতি এবং ওয়াই ডব্লিউ সি এ (দিল্লী), এছাড়াও এ আই এস এ এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা, জে এন ইউ, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেন। পার্লামেন্ট স্ট্রীটের সমাবেশে সুধা সুন্দরারমন (এ আই ডি ডব্লিউ এ), কবিতা কৃষ্ণাণ (এ আই পি ডব্লিউ এ) প্রমুখরা বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনায় ছিলেন এ আই ডি ডব্লিউ এ-র ফারুকি। মঞ্চে ছিলেন সুচেতা দে (এ আই পি ডব্লিউ এ) যিনি দিল্লীর গণধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্বকারীদের অন্যতম। সমাবেশে প্রতিবাদকারীদের উদ্দেশ্যে কবিতা তার ভাষণের প্রথমে শত বৎসরের সমস্ত সংগ্রামী মহিলা শ্রমিকদের সেলাম জানিয়ে তাঁদের স্মৃতিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের কথা বলেন। উড়িষ্যায় পসকো প্রতিরোধে মহিলাদের তেজস্বীতাকে তিনি ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। উল্লেখ করেন, প্রতিবাদী নারীরা নারী দিবসের কয়েকদিন আগে পসকোর জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কয়েকজন মহিলা নিজেদের জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে প্রতিবাদ জানানোর জন্য পুলিশ তাঁদের লাঠিচার্জ করে এবং ফৌজদারী আইনে গ্রেফতার করে। কুড়ানকুলামের পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মহিলাদের কথাও বলেন। কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মহিলাদের জন্য বিচার, নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশের ধর্ষণের শিকার সোনি সোরির জন্য বিচারের দাবির কথাও বলেন। সরকার এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপি মিলিতভাবে ভার্মা কমিটির সুপারিশগুলোকে লঘু করে ও ধ্বংস করে দিতে চাইছে এবং ধর্ষণ আইনের মধ্যে নারী-বিরোধী প্রস্তাবনা চালু করতে চাইছে। তিনি উল্লেখ করেন সরকারের অর্ডিন্যান্স এবং বিজেপির নেতা ভেঙ্কাইয়া নাইডুর নেতৃত্বে স্ট্যাণ্ডিং কমিটির বিলে একইরকম প্রস্তাবনা রয়েছে—যেটা হল পুরুষরাও মহিলাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চার্জ আনতে পারবে এবং সম্মতি প্রদানের বয়সকে ১৬ থেকে ১৮ করার প্রস্তাব, সরকারি কর্মী, প্রতিরক্ষাবাহিনীর অফিসারদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চার্জ না আনার সুরক্ষা, আফস্পা (সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন)-র কোন সংশোধন হবে না এবং স্বামীর দ্বারা স্ত্রীকে ধর্ষণের অগ্রাহ্যতা। কেবলমাত্র মহিলা আন্দোলনের চাপ এবং লাগাতার রাজপথের সংগ্রামই সরকারকে বাধ্য করেছে ধর্ষককে 'লিঙ্গ-নিরপেক্ষ' এবং সম্মতি প্রদানের বয়সকে বাড়ানোর অপচেষ্টাকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য। মহিলারা নিশ্চয়ই পুরুষদের ধর্ষণ করার জন্য ঘুরে বেড়ায় না সুতরাং তাদের কেন ধর্ষণের অপরাধী বলা হবে? তিনি আরও বলেন, সম্মতি প্রদানের বয়সকে যদি বাড়ানো হয় তাহলে সমবয়সী কিশোর-কিশোরীদের সহবাসে সম্মতি থাকলেও তাদের ধর্ষক বলে চিহ্নিত করা হবে। তিনি দাবি করেন দোষী পুলিশ অফিসারদের জবাবদিহি করার জন্য কঠোর ব্যবস্থাপনা রাখতে হবে। কুনান পশপোরা এবং থাঙ্গজাম মনোরমার ধর্ষণের উল্লেখ করে তিনি স্মরণ করান এরকম উপদ্রুত এলাকার বহু ঘটনার কথা এবং আফস্পার প্রত্যাহার দাবি করেন।

মহিলারা যেহেতু পুরুষদের যৌন সম্পত্তি নয়, সেহেতু ধর্ষণ আইন থেকে বৈবাহিক জীবনে ধর্ষকদের ছাড় দেওয়ার জন্য আপত্তিকর যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেগুলোর অপসারণ দাবি করেন তিনি। ধর্ষকদের ফাঁসী দিলেই যে মহিলারা খুব নিরাপত্তা ভোগ করবেন তা নয় বরং ধর্ষকদের উৎসাহিত করা হবে যাতে তারা ধর্ষিতাদের হত্যা করে। ১৬ ডিসেম্বরের সাহসিনী মহিলার প্রতি তিনি সেলাম জানান এবং বলেন তাঁর সংগ্রামই নতুন করে শুধু ভারতে নয় সারা পৃথিবীতে ধর্ষণ ও যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তিনি দাবি করেন সরকার এবং পার্লামেন্টের উচিত হল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো শুধু কথায় নয়, ভার্মা-প্যানেলের সুপারিশ মেনে একটি লিঙ্গ-যথার্থ আইন প্রণয়ন করা।

বিহার ঃ আইপোয়া বিহারের জেলা শহরগুলোতে বিচারক ভার্মা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের দাবিতে প্রতিবাদী মিছিল সংগঠিত করে। তাঁরা দাবি করেন, নীতীশ সরকারের মদ বিক্রির পলিসির এবং ইরম শর্মিলা চানুর বিরুদ্ধে আত্মহত্যার চার্জ আনা ও আফস্পার প্রত্যাহার। পাটনায় বিধানসভা পর্যন্ত প্রতিবাদী মিছিল ও সমাবেশ হয়। এ আই এস এ এবং আর ওয়াই এ মগধ মহিলা কলেজ পর্যন্ত মিছিল করে যাতে অংশ নেন বহু মহিলা ও পুরুষ ছাত্র-ছাত্রী, দাবি ওঠে নির্ভয় স্বাধীনতার। এছাড়া সিওয়ান, বক্সার, ভোজপুর এবং অন্যান্য জেলাতেও জোরদার প্রতিবাদী মিছিল হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ কাঁকিনাড়া জেলার কালেক্টর অফিসের সামনে আইপোয়া ধর্ণার আয়োজন করেছিলেন। খাম্মাম জেলার সাথুপল্লিতে প্রতিবাদী মিছিল হয়। অনন্তপুরমে কালেক্টর অফিসের সামনে ধর্ণা দেওয়া হয়। প্রতিবাদী সমাবেশ হয় বিজয়ওয়াড়াতে। নুজিভিদুতে মিড-ডে-মিলের শ্রমিকরা রেভিনিউ ডিভিসনাল অফিসের সামনে ধর্ণায় বসেন।

উত্তরাখণ্ড ঃ এ আই এস এ এবং আইপোয়া বহু জায়গায় ভার্মা কমিটির সুপারিশকে কার্যকরী করার দাবিতে এবং মুজাফফরনগরে ১৯৯৪ সালে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের দাবিতে সংগ্রামী মহিলাদের গণধর্ষণে দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদী মিছিল করেন। পিথোরাগড়ে এ আই এস এ, মিউনিসিপ্যালিটি হলে সেমিনার করেন এবং পরে ধর্ষকদের লিঙ্গ নিরপেক্ষতার ধারার প্রতিবাদে কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্স পোড়ানো হয়। সেমিনারে নারী সমাজসেবী নম্রতা বোরা, আইপোয়ার কর্মী শীলা পুনেথা, এ আই এস এ-র হেমন্ত খাটি, সি পি আই (এম এল)-এর জেলা সম্পাদক জগৎ মারতোলিয়া সহ বহু মানুষ ছিলেন। ভিকিয়াসেনে এ আই সি সি টি ইউ অন্তর্ভুক্ত আশা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং আইপোয়া বাজারের মধ্যে সমাবেশ করেন। বক্তব্য রাখেন পার্টির নেতা পুরুষোত্তম শর্মা। রুদ্রপুরে এ আই এস এ আয়োজিত সেমিনারে পুঁজি এবং যৌন হিংসা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ছাত্র-ছাত্রীরা। রুবি ভরদ্বাজের নেতৃত্বে ঐ বিষয়ে আলোচনাও হয়। পরে পার্টি নেতা কে কে বোরা ভাষণ দেন সেমিনারে। সেমিনার পরিচালনা করেন ললিত মাতিয়ালি। শ্রীনগরে গাড়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজম ছাত্রছাত্রীরাও সেমিনারের আয়োজন করেন যেখানে অংশ নেন এ আই এস এ এবং সি পি আই (এম এল) কর্মীবৃন্দ। পার্টির পক্ষে ইন্দ্রেশ মইখুরি এবং এ আই এস এস-র কুলদীপ সৈলানি সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।

বহিসার (মুম্বাইয়ের দহিসার, মহারাষ্ট্র) ঃ তারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু গ্রামের মহিলারা ৮ মার্চ নারী দিবস পালন করেন। গ্রামের কমিউনিটি হলে মহিলারা সমাবেশিত হন এবং সভা করেন। সি পি আই (এম এল)-এর জাম্ভলপাড়া ইউনিটের কমরেড লীলা দুবলার সভাপতিত্বে মিটিং চলে এবং পার্টির বহু কর্মী বক্তব্য রাখেন।

রাঁচী ঃ আইপোয়ার নেতৃত্বে অ্যালবার্ট এক্কা চকে সভা হয়। দাবিগুলো হল—''নির্ভয় গণতন্ত্র'', ''ভার্মা কমিটির সুপারিশ কার্যকরি কর'' এবং ''সমস্ত ধরনের যৌন হিংসার বিরুদ্ধে একটি কার্যকরি আইন, মর্যাদা এবং মহিলা শ্রমিকদের তথা পরিচারিকাদের উপযুক্ত মজুরি'' এবং ''ঝাড়খণ্ডের মহিলাদের জন্য একপ্রস্থ কর্মনীতি''। সভা শুরু হয় উদাত্ত কণ্ঠের সমবেত সংগীতে যার প্রথম লাইনটি হল ''বিশ্ব গগনে নতুন তারা—অর্ধ আকাশ অর্ধ বিশ্বের মালিক মোরা''! সভায় ভাষণ দেন যথাক্রমে আইপোয়ার রাজ্য সম্পাদক সুনিতা, সভাপতি গুন্নি ওঁরাও, রাঁচি জেলার উপ-সভাপতি শান্তি সেন এবং জে এস এম-র অনিল অংশুমান। আইপোয়ার সম্পাদক সরোজিনী বিস্ট সভা পরিচালনা করেন। জে এস এম-র প্রেরণা টীম কনভেনর এবং আইপোয়ার নেত্রী সনি তিরিয়া গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ছত্তিশগড়ের রুয়াবান্ধ সেক্টর (ভিলাই) ঃ আইপোয়া মহিলাদের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, অধিকার, ভার্মা কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করার দাবি এবং সোনি সোরির মুক্তি, ধর্ষক পুলিশ অফিসার সহ সালওয়া জুডুমের ধর্ষক নেতৃত্বের শাস্তির দাবিতে সভা-সমাবেশ করেন। আইপোয়া এবং মহিলা মুক্তি মোর্চা ভিলাইয়ের সুপেলার ঘড়ি চকে ধর্ণায় বসেন। মহিলা কন্ট্রাক্ট শ্রমিকরা ধর্ণায় অংশ নেন।

জাতীয় পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য

সাতের পাতার পর

গোর্খাল্যাণ্ড রাজ্যের দাবি গোর্খা জনগণের মধ্যে যথেষ্ট সজীব হয়ে রয়েছে। আমরা ১৯৯০-এর দশকে গোর্খাল্যাণ্ড প্রশ্নে সি পি আই (এম) ছেড়ে বেরিয়ে আসা সি পি আর এম-কে—যে সংগঠন এখন এ আই এল সি-র শরিক, সমর্থন করি—যারা পৃথক এক গোর্খাল্যাণ্ডের দাবির মধ্যেও দার্জিলিং পাহাড়ে লালঝাণ্ডাকে উড্ডীন রাখতে সচেষ্ট।

২৬। আমাদের পার্বত্য জেলাগুলোতে—কার্বি আংলঙ ও উত্তর কাছার পার্বত্য অঞ্চল যার বর্তমান নাম ডিমাহাসাও—ভারতীয় সংবিধানের ২৪৪এ ধারায় স্বীকৃত স্বশাসিত রাজ্য সৃষ্টির দাবিতে দীর্ঘ গণআন্দোলন চালিয়ে আসছে। একের পর এক সরকার কর্তৃক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠস্বরে কর্ণপাত করতে নারাজ হওয়ায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের জায়গা নিয়েছে সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং ৩ ধারা মোতাবেক পৃথক রাজ্যের দাবি জোরদার হচ্ছে। সরকার ডিমাহাসাও-এর এ ডি এইচ ডি-র দুই প্রতিদ্বন্দ্বি গোষ্ঠী ও কার্বি আংলঙে ইউ পি ডি এস-এর সঙ্গে পৃথক পৃথক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তিগুলো পুরোপুরি অপ্রতুল এবং প্রতারণাপূর্ণ বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে এবং পরিস্থিতির আদৌ উন্নতি হয়নি। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য জনগণের আকাঙ্খা অধরাই রয়ে গেছে এবং এক স্বশাসিত রাজ্য বা পৃথক পার্বত্য রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন জারি রয়েছে। এই অঞ্চলের ঐক্যবোধ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং জনগণের অধিকার ও কল্যাণের প্রয়োজনে সি পি আই (এম এল) পৃথক রাজ্য অথবা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সহযোগিতায় প্রস্তুত।

২৭। বিদর্ভ ও বুন্দেলখণ্ড রাজ্য গঠনের দাবির পিছনেও দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং দাবিগুলোর পক্ষে যথেষ্ট জনসমর্থনও আছে। উন্নততর প্রশাসনের নামে প্রায়শই ছোট রাজ্যকে না মানার যে তত্ত্ব খাড়া করা হয় তা খারিজ করার সাথে সাথে আমরা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা নতুন নতুন রাজ্য গঠনের জনপ্রিয় দাবিগুলো পূরণ সমেত যুক্তরাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যকে সমর্থন জানাই। এই সমস্ত দাবিগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ও আন্তরিকভাবে নিষ্পত্তির জন্য দ্বিতীয় এক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করি। ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য এবং অনগ্রসর রাজ্য ও অঞ্চলসমূহে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী কৃষির বিকাশের জন্য আমরা বিশেষ জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাই।

২৮। দুর্নীতি সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করায়, এক দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থার দাবি এখন রণধ্বনি হয়ে উঠেছে। ২০১১-তে আন্না হাজারের নেতৃত্বে জন লোকপাল আন্দোলন ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। ঘটনচক্রে আন্দোলনটি দুটি দিশায় বিভক্ত হয়ে যায়—যার মধ্যে টিম আন্নার একটি অংশ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আম আদমি পার্টি নামে নতুন দল গঠন করে—যার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হল কংগ্রেস ও বিজেপি মদতপুষ্ট পুঁজিতন্ত্র, যা স্বজন-পোষণের ওপর ভিত্তি করে থাকে। এর মধ্য দিয়ে অ-দলীয় ও নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকার প্রতিষ্ঠিত এনজিও রাজনীতির থেকে তাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। আন্না হাজারে ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল—উভয়েই দুর্নীতিকে মুখ্যত সরকার চালানোর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় বলে মনে করে ও যে সমস্ত নীতিমালা এই দুর্নীতি ও কর্পোরেট লুণ্ঠনকে শক্তি যোগায় তার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। বিপরীতে, আমরা কর্পোরেটমুখী নীতিগুলো প্রত্যাহারের দাবি জানাই, কৃষি, অরণ্য ও উপকূলভূমি রক্ষা এবং গ্রামসভাগুলোর অধিকার রক্ষায় দাবি জানাই এবং দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের প্রধান বিষয়বস্তু হিসাবে কালো টাকা ও বেআইনি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ও খনিজ সম্পদের জাতীয়করণ করার দাবি জানাই। সাথে সাথে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানকে আমরা বৃহত্তর গণআন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচনার ওপর জোর দিই।

২৯। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিষয়ে গণআন্দোলনগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের পার্টি উৎসাহভরা ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং ধারাবাহিক ও বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে আমাদের কমরেডদের নেতৃত্বে চালিত গণসংগঠনগুলো সামনের সারিতে থেকেছে। বিধানসভা ও সম্পর্কিত অন্যান্য মঞ্চে জনগণের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরার জন্য ঝাড়খণ্ডে আমাদের একমাত্র বিধায়ক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং আদিবাসী ও শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন আন্দোলনের পাশে থেকেছেন। ২০১০-এর নির্বাচনে বিহারে আমরা বড় ধাক্কার মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু প্রতিকূল নির্বাচনী ফলাফলে বিচলিত না হয়ে পার্টি তার রাজনৈতিক ভূমিকা ও উদ্যোগের বিস্তার ঘটিয়েছে এবং নীতীশ কুমারের সামন্ত-সাম্প্রদায়িক জমানার ধারাবাহিক ও গতিশীল বিরোধী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

৩০। কর্পোরেট রাষ্ট্রের ফাঁদে আবদ্ধ দুর্নীতির জাল (এই) ব্যবস্থার যৌক্তিকতাকে প্রবল প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিচার বিভাগ ব্যবস্থাকে উদ্ধারের জন্য তার সক্রিয়তাকে বাড়িয়ে তুলেছে এবং গভীরতর সঙ্কট থেকে ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য নানা সংস্কার কর্মসূচীকে হাজির করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে শাসকশ্রেণীগুলো দেশকে কর্পোরেট লুণ্ঠন ও গভীর অর্থনৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর এখন রাজনৈতিক সংস্কারের নামে তারা জনগণের অধিকারকে খর্ব করা ও জনগণের অংশগ্রহণকে সীমায়িত করতে চাইছে। শাসকশ্রেণীকে যদি বিনা বাধায় তাদের মত এগিয়ে চলতে দেওয়া হয় ভারত তাহলে কর্পোরেট-ফ্যাসিবাদীদের দখলদারিতে পরিণত হবে। বিপরীতে, আমরা যদি জনগণের মধ্যে গভীরভাবে মোহমুক্তি ঘটার যে সূচনা হয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারি এবং জনগণের ক্রোধকে এক প্রগতিশীল দিশায় পরিচালিত করার প্রতিটি সুযোগকে আঁকড়ে ধরতে পারি তাহলে ন্যায়, গণতন্ত্র ও সামাজিক রূপান্তরণের দাবিতে সংগ্রামের ক্ষেত্রে বর্তমান সন্ধিক্ষণে আমরা আরও বৃহৎ বৃহৎ বিজয় অর্জন করতে পারি। বিকাশমান পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে এবং আরও সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পার্টির নবম কংগ্রেস অবশ্যই সংকল্প গ্রহণ করছে।

উগো চাবেস ঃ সেনানায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক

চাবেসের জন্ম হয় ২৮ জুলাই ১৯৫৪। তাঁর বাবা-মা দুজনেই ছিলেন গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ভেনেজুয়েলার এক নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রামীণ পরিবেশে চাবেসের বড় হয়ে ওঠা। চাবেস মানুষ হন তাঁর ঠাকুরমার কাছে, যিনি ছিলেন এক ধর্মপ্রাণা খ্রীষ্টান, আর এর প্রভাব পড়েছিল এমনকি সমাজতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ চাবেসের ওপরেও। ছোটবেলায় তাঁর আগ্রহের বিষয়ের মধ্যে ছিল ছবি আঁকা, বেসবল খেলা আর ইতিহাস পড়া। সতেরো বছর বয়সে তিনি ছাত্র হিসেবে কারাকাসের মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। এখানে ছাত্র অবস্থায় থাকাকালীন তিনি গল্প, কবিতা লেখা শুরু করেন। পাশাপাশি চলতে থাকে ছবি আঁকা এবং নাট্যচর্চাও। এ সময়েই তিনি সাইমন বলিভার এবং চে গেভারার রচনা পড়েন ও তার দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। ১৯৭৪-এ পেরুর মুক্তিযুদ্ধের সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনি ভেনেজুয়েলার প্রতিনিধি দলে নির্বাচিত হন। পেরুতে তৎকালীন বামপন্থী শাসক আলাভারাদোর বক্তৃতা তাকে উজ্জীবিত করে। পানামার বামপন্থী রাষ্ট্রপতি ওমার টোরিজোস দ্বারাও তিনি ভালো মাত্রায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে চিলিতে এই সময়কালে প্রতিবিপ্লব সাধিত হয় সি আই এ-র প্রত্যক্ষ মদতে। চিলির মার্কিন বশংবদ নয়া সেনা শাসক পিনোচেত সম্পর্কে চাবেসের বিতৃষ্ণা ছিল সীমাহীন।

স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করার পর যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসার হিসেবে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। সেইসময় চাবেসের বাহিনীর ওপর দায়িত্ব পড়েছিল একটি মার্কসবাদী লেনিনবাদী অভ্যুত্থানকে দমন করার। যদিও চাবেস এই কাজে যোগ দেওয়ার আগেই এই অভ্যুত্থান মোটামুটি সমাপ্ত হয়ে এসেছিল, কিন্তু অভ্যুত্থানকারীদের ফেলে রেখে যাওয়া বেশ কিছু বইপত্র চাবেসের হস্তগত হয়। বইগুলোর লেখকদের মধ্যে ছিলেন কার্ল মার্কস, লেনিন এবং মাও। চাবেস এই সমস্ত লেখালেখি মন দিয়ে পড়েন। এই বইগুলো ভেনেজুয়েলায় একটি বামপন্থী সরকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চাবেসের ভাবনাকে আরও অনেকদূর উসকে দেয়। সেনাবাহিনীর মধ্যেই অল্পসংখ্যক অনুগামী নিয়ে তিনি ভেনেজুয়েলান পিপলস্ রিপাবলিকান আর্মি নামে একটি গোপন সংগঠন তৈরি করেন। এই সময়ে চাবেস ও তার সঙ্গীরা একটি মধ্যপন্থী নীতিমালায় বিশ্বাসী ছিলেন, তা পুরোপুরি দক্ষিণপন্থী বা বিপ্লবী কোনটাই ছিল না। ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন বাম মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে জোটের আকাঙ্খায় চাবেস এই সময়পর্বে তাদের সঙ্গে অনেকগুলো গোপন বৈঠক করেন। ভেনেজুয়েলান পিপলস্ রিপাবলিকান আর্মি গঠনের পাঁচ বছর পর চাবেস সেনাবাহিনীর মধ্যে আরও ব্যাপক পরিসর সমৃদ্ধ একটি নতুন গোষ্ঠী গঠন করেন, যার নাম দেওয়া হয় বলিভারীয় বিপ্লবী বাহিনী-২০০। জামোরা, সাইমন বলিভার এবং রডরিগেজ-এর মত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ইতিহাস পুরুষদের প্রেরণা এর পেছনে সক্রিয় ছিল। পুঁজিবাদ এবং মার্কসবাদ উভয়ের বেশ কিছু উপাদানকে যুক্ত করে বলিভারীয় এই বাহিনী মূলত ভেনেজুয়েলা এবং লাতিন আমেরিকার সমকালীন নয়া উদারনৈতিক অর্থব্যবস্থাকে আঘাত করতে চেয়েছিল আর সরে আসতে চেয়েছিল সোভিয়েত ধাঁচের একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকেও। ইতোমধ্যে সেনাকর্তাদের একাংশ চাবেসের বলিভারীয় বিপ্লবী বাহিনীর বিষয়ে ইঙ্গিত পান, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাকে বরখাস্ত করা যায়নি। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় প্রত্যন্ত প্রদেশে। সেখানে চাবেস স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৯৮৮-তে চাবেস মেজর পদে উন্নীত হন এবং আবার ফিরে আসেন রাজধানী কারাকাসে।

ইতোমধ্যে ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে জিতে পুনঃনির্বাচিত হন রাষ্ট্রপতি পেরেজ এবং জিতে এসেই ভর্তুকিতে কাটছাঁট শুরু করেন। জনগণের বিক্ষোভ শুরু হয় এবং তাকে রোখার জন্য নামানো হয় নির্মম দমন নীতি। এতে মারা যান ২৭৬ জন, বেশ কয়েক হাজার মানুষ আহত হন। দেশজোড়া দমন, দুর্নীতি আর রাজনীতিবিদ ও পুঁজিপতিদের মধ্যে অশুভ জোটের প্রেক্ষিতে চাবেস মিলিটারির মধ্যে একটি অভ্যুত্থান বা ক্যু দে তা সংগঠিত করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ এই অভ্যুত্থানের দিন নির্ধারিত হয়। ঠিক হয় এইদিন চাবেসের নেতৃত্বাধীন পাঁচটি সেনা ইউনিট রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, সেনা এয়ারপোর্ট, সেনা জাদুঘরের দখল নেবে। রাষ্ট্রপতি পেরেজকে বন্দী করা ছিল প্রাথমিক লক্ষ্য। পরবর্তী সময়ে করা বিশ্লেষণ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে চাবেসের দশ শতাংশ সমর্থন থাকলেও নানারকম ভুলভ্রান্তি, দুর্বল পরিকল্পনা, বিশ্বাসঘাতকতা, অন্তর্ঘাত প্রভৃতি কারণে এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বুঝতে পেরে চাবেস সরকারের হাতে ধরা দেন। তাঁকে জাতীয় দূরদর্শনে বক্তব্য রাখার সুযোগের শর্তের বিনিময়ে তিনি অভ্যুত্থানে প্রস্তুত সেনাদের অভ্যুত্থান প্রয়াস সংবরণ করতে বলেন। মাত্র সামান্য সময়ের বক্তব্যে তিনি জানান এবারের মতো তারা তাদের সংকল্পে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার সুযোগ আসবে আর দেশকে আরও ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এরপর চাবেসকে বন্দী করা হয়। বন্দিত্বকালীন সময়েই লক্ষিত হয় চাবেসের পক্ষে জনসমর্থন ক্রমশ বাড়ছে। বছর খানেকের মধ্যে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি পেরেজ দুর্নীতির দায়ে পদ ছাড়তে বাধ্য হলে ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন হয়। নতুন রাষ্ট্রপতি রাফায়েল ক্যালডেরা ক্ষমতায় এসে চাবেস ও অন্যান্য বন্দী অভ্যুত্থানকারীদের মুক্তি দেন। জেলের বাইরে এসে শুরু হয় চাবেসের রাজনৈতিক জীবনের নতুন অধ্যায়। ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি ১৯৯৮ সালের ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। শ্রমিকশ্রেণী ও দেশের গরিব জনগণের বিরাট সমর্থন চাবেসকে বিজয়ী করে। শুরু হয় রাষ্ট্রনায়ক চাবেসের পথ চলা ও ভেনেজুয়েলার রূপান্তরের ইতিহাস, যা বদলে দিতে থাকে গোটা লাতিন আমেরিকাকে।

ক্ষমতাসীন হয়ে চাবেস প্রথমেই যে কাজগুলো করা শুরু করেন তার মধ্যে ছিল ''বলিভার ২০০০ পরিকল্পনা'' নামক একগুচ্ছ প্রকল্প শুরু করা। এর আওতায় সড়ক ও গৃহ নির্মাণ ও বুনিয়াদী স্বাস্থ্য পরিষেবা, টীকাকরণের কাজ ব্যাপকমাত্রায় শুরু হয়। বড় বড় ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কৃষিজোতের কর ফাঁকি রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শাসনকালের প্রথম পর্বে চাবেস পুঁজিবাদের ঘোষিত বিরোধী ছিলেন না, কেবল নয়া উদারনৈতিক লুণ্ঠন ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি সহনীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্রিয় ছিলেন। এজন্য দেশের বিরাট তৈল ভাণ্ডারকে তিনি কাজে লাগান। কিউবাকে সস্তায় প্রচুর তেল দেওয়ার বিনিময়ে সেখানকার হাজার হাজার চিকিৎসক ভেনেজুয়েলার গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেন। চাবেস ক্ষমতাসীন হওয়ার যে নতুন সংবিধান তৈরি হয় তার ৮৩, ৮৪ এবং ৮৫ নম্বর ধারায় স্বাস্থ্যকে মৌলিক সামাজিক অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়েছে, বলা হয়েছে তা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। শুধু আপ্তবাক্য আওড়ানো নয়, কথাগুলোকে বাস্তবে পরিণত করতে চাবেস আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছেন।

জনস্বাস্থ্যের পাশপাশি চাবেসের সরকার বিশেষ নজর দেয় জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার দিকটিতে। নেওয়া হয় ''মিশন মারকাল'' প্রকল্প। গরিবদের বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য দেশজুড়ে একশোটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়, স্বল্পমূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য খোলা হয় ২৫,০০০-এরও বেশি বিপণী। শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে চালু করা হয় মিশন রিবাস। এর মাধ্যমে নিখরচায় শিক্ষা, খাবার, থাকার ব্যবস্থা, যাতায়াতের অর্থ দেওয়া হয়। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য শিক্ষা বাসস্থান আর খাবারের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রের সে ব্যাপারে দায়িত্ব তুলে নেওয়াই নয়, এমনকি শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে নান্দনিক বিকাশের দিকেও চাবেসের ভেনেজুয়েলা সরকার বিশেষ নজর দেয়। ভেনেজুয়েলার সংসদে পাশ হওয়া একটি আইন অনুসারে ভেনেজুয়েলার প্রত্যেক শিশু-কিশোরের যন্ত্রসঙ্গীত শেখার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

তবে শুধু কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণাতেই চাবেস আটকে থাকেন নি। ক্রমশ তাঁর ভাবনা আরও প্রগতির দিকে এগিয়েছে। ২০০২ সালে তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর একাংশের অভ্যুত্থানের পরেই চাবেস ''মানবিক পুঁজিবাদের'' ধারণা থেকে ক্রমশ সরে আসতে থাকেন। মানবিক পুঁজিবাদ থেকে সরতে সরতে তিনি এসে পৌঁছন 'একুশ শতকের সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার স্থপতির জায়গায়। ভূমি সংস্কার কর্মসূচী প্রথম থেকেই চাবেসের গুরুত্ব তালিকায় ওপর দিকে ছিল, ক্রমশ জোর পড়তে থাকে সমবায়ের ওপর। দেশজুড়ে হাজার হাজার সমবায় গড়ে ওঠে, পেছনে সক্রিয় ছিল রাষ্ট্রের সমর্থন। বস্তুতপক্ষে ভেনেজুয়েলায় সমবায় আন্দোলনের পরিধি এত ব্যাপক যে তা এক স্বতন্ত্র চর্চার বিষয়। চাবেসের সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক কারখানার ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

তবে চাবেস সারা বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত হয়েছেন তার তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী অবস্থানের জন্য, লাতিন আমেরিকা জোড়া এক প্রতিবাদী অক্ষর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন এবং চীনের সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির পথে হাঁটার সুবাদে সারা বিশ্বে যখন মার্কিন দাপট এবং নিও লিবারাল অর্থনীতির একচেটিয়াকরণ শুরু হয়, তখন লাতিন আমেরিকা থেকেই প্রথম অন্য স্বর শোনা গিয়েছিল। এই অঞ্চলে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে প্রায় একক কণ্ঠস্বর হয়ে পড়া দ্বীপরাষ্ট্র কিউবার পাশে এসে দাঁড়ায় চাবেসের নেতৃত্বাধীন ভেনেজুয়েলা। বিশ্বের অন্যতম প্রধান তৈল রপ্তানীকারক এই দেশ তার তেলের খনিগুলোর জাতীয়করণ করার দিকে এগোনোর মধ্য দিয়ে মার্কিন ও অন্যান্য বহুজাতিক কর্পোরেটদের তেলের থেকে বিপুল মুনাফা অর্জনের রাস্তা বন্ধ করে। মার্কিন কর্পোরেট সংস্থাগুলো আগে ভেনেজুয়েলায় ব্যাপক অর্থনৈতিক লুণ্ঠন চালাত, চাবেস সরকারের নীতি সেখানে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও দেশের ভেতরে দারিদ্র দূরীকরণ, জনস্বাস্থ্য জনশিক্ষা প্রসারের কাজ দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। ভেনেজুয়েলায় চাবেসের এইসব কর্মকাণ্ডে উৎসাহ সৃষ্টি হয় পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও। লাতিন আমেরিকার অনেকগুলো দেশে সামাজিক আন্দোলন গতি পায়। বিভিন্ন দেশে এই আন্দোলনগুলো নতুন নতুন প্রেসিডেন্টকে বিজয়ী করে দেশ শাসনের দায়িত্ব দেয়। ২০০২ সালে চিলিতে রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে বিজয়ী হন রিকার্ডো লাগোস, ব্রাজিলে লুলা। ২০০৩ সালে আর্জেন্টিনার নির্বাচনে বিজয়ী হন নেসটর কির্কনার, উরুগুয়েতে ২০০৫ সালে নির্বাচনে জেতেন তাবারে ভাজকুয়েজ। ২০০৬ সালে চিলিতে মিশেল বাশালেত, বলিভিয়ায় ইভো মোরালেস, ইকুয়েডরে রাফায়েল কোরেয়া ও নিকারাগুয়ায় ড্যানিয়েল ওর্তেগা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ২০০৭ সালে আর্জেন্টিনায় ক্রিস্টিনা ফের্নানদেজ ও ওয়েতমালায় আলভারো কলোম রাষ্ট্রপতি পদে বসেন। প্যারাগুয়েতে ২০০৮ সালে ফের্নাদো লুগা এবং এল সালভাদোরে ২০০৯ সালে মরিসিও ফুয়েনেস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সে বছরই ইকুয়েডরে রাফায়েল কোরেয়া ও বলিভিয়ায় ইভো মোরলেস দ্বিতীয়বারের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। উরুগুয়েতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন হোসে মুজিকা।

এই নতুন অধ্যায়কে চাবেস চিহ্নিত করেন লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের প্রবাদপ্রতিম নেতা সাইমন বলিভারের নামে। তৈরি হয় ''বলিভারিয়ান আল্যায়েন্স ফর দ্য আমেরিকানস্''। ভেনেজুয়েলা আর কিউবা ছাড়াও এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আছে অ্যান্টিগা, বলিভিয়া, ডমিনিকা, ইকুয়েডর, নিকারাগুয়া, সেইন্ট ভিনসেন্ট, সুরিনাম, সেইন্ট লুসিয়া। তার একটি নতুন মুদ্রার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের দিকে এগোচ্ছেন, উদ্দেশ্য মার্কিন ডলারের একাধিপত্যের বাইরে আসা। ইতোমধ্যেই ভেনেজুয়েলা ও ইভো মোরালেসের নেতৃত্বাধীন বলিভিয়ার মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পেরু, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার মত বিভিন্ন দেশের সামাজিক আন্দোলন মার্কিন বিরোধী এই নতুন অক্ষকে শক্তিশালী করছে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই আন্দোলনের জোয়ারের সময় চাবেসের মৃত্যু নিঃসন্দেহে একটি বড় আঘাত। কিন্তু ভেনেজুয়েলা তথা দক্ষিণ আমেরিকার সংগ্রামী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানুষ যে ঐতিহাসিক লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন, সমস্ত প্রতিকূলতাকে পেরিয়ে তারা তাতে অবিচল থাকবেন, সাম্প্রতিক কয়েক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস তেমন প্রত্যয়ই জাগায়। **- সৌভিক ঘোষাল**

চতুর্থ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

বিষয় ঃ বর্তমান সময়ে বাংলার লোকসঙ্গীতের বিবর্তন

স্থান ঃ ইন্দুমতি সভাগৃহ (যাদবপুর)

(শিয়ালদহ থেকে ৪৫, ৪৫ এ, কে-৮—বেঙ্গল ল্যাম্প বাস স্টপ)

বক্তা ঃ লোকশিল্পী অভিজিৎ বসু

১৩ এপ্রিল ।। সময় ৬টা

আয়োজক ঃ চিত্রচেতনা

পাঞ্জাবে কৃষকদের ওপর পুলিশী দমন

পাঞ্জাবে গমের সহায়ক মূল্য অবিলম্বে বাড়ানোর দাবিতে ১৭টি কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন-এর একটি মঞ্চ রাজ্য জুড়ে গত ৬ মার্চ জেলা সদরগুলোতে প্রতিবাদী কর্মসূচীর ডাক দেয়। আর তার আগের দিন ৫ মার্চ রাতে পুলিশ ব্যাপক হানা দিয়ে কৃষক নেতা ও কর্মীদের পাইকারিভাবে গ্রেপ্তার অভিযান চালায়। পরের দিন তা সত্ত্বেও কৃষকরা যেখানে যেখানে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে গেছে, যেমন গুরুদাসপুর, জলন্ধর ও অন্যত্র, সর্বত্রই পুলিশ গণ গ্রেপ্তারী চালিয়েছে। ধৃত বন্দীর সংখ্যা মোট প্রায় ২৫০০। সি পি আই (এম এল) এবং অন্যান্য বামদলের বিশাল সংখ্যায় নেতা ও সদস্যরা এখন কারাগারে বন্দী। সি পি আই (এম এল)-এর ধৃত রাজ্য কমিটি সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন গুরমিত বাখপুরা, গুলজার সিং, সুখদেব সিং, রুলদু সিং, গুরজন্ত্ সিং, গুরনাম ভিখি ও গুরপ্রীত রুরেকে। এছাড়া, পার্টির বহু কর্মী, এ আই এস এ-র কর্মীরা বিভিন্ন জেলে বন্দী হয়ে রয়েছেন। যেমন, ২০০ সদস্য রয়েছেন গুরুদাসপুর জেলে, ১৫০ সদস্য মানসা জেলে। সি পি এম-এর পাঞ্জাব নেতাদের মধ্যে জেলে বন্দী আছেন রাঘবীর সিং, লাল চাঁদ, আত্মারাম প্রমুখ।

প্রচন্ড দমন নেমে আসা সত্ত্বেও প্রতিবাদীরা নিপীড়নকে পরোয়া না করে তাঁদের প্রতিবাদী কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। শহর ও গ্রামে সরকারের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। মানসা জেলে সি পি আই (এম এল) সদস্যরা রিলে অনশন শুরু করে দেন, অন্যান্য জেলেও তা ছড়িয়ে পড়ে। পরে ১৭ সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৮ মার্চ পাঞ্জাব রাজ্য জুড়ে জেলা সদরগুলোতে সমস্ত বন্দীদের মুক্তির দাবিতে অনির্দিষ্টকালব্যাপী ধর্ণা কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান দেওয়া হয়। তরণ তারণে একজন মহিলার উপর পুলিশ যে বর্বরতা চালায় সেটা সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রতিবাদী কণ্ঠকে রোধ করতে এবং যে গণ গ্রেপ্তারী অভিযান চলল সেটা পাঞ্জাবে প্রকাশ সিং বাদল জমানায় পুলিশী সন্ত্রাসের আরেকটি নজীর দেখিয়ে দিল।

বিহারে শিক্ষকদের উপর এবং গণহত্যার অভিযুক্তদের খালাস পাওয়ার বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ

বিহারে রাজধানী পাটনায় শিক্ষকদের উপর প্রচন্ড পুলিশী নিপীড়ন চালানোর প্রতিবাদে, যাকে সুপ্রীম কোর্টে আরেক জালিয়ানওয়ালাবাগ বলে মন্তব্য করা হয়েছে, ৬ মার্চ ঐ রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ সংগঠিত হয়।

প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ ফেটে পড়ে পাটনা, আরা, সিওয়ান, জাহানাবাদ, আরোয়াল, গয়া, দারভাঙ্গা, পাটনা গ্রামীণ, মজফফরপুর ও অন্যান্য জেলাসদরে। বিক্ষোভ চলাকালীন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। পাটনায় জে পি চক থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচী থেকে দাবি তোলা হয়— নীতীশ কুমার-এর বিহার সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে, সম কাজে সম মজুরি দিতে হবে এবং বিক্ষোভ-আন্দোলনকারিদের দাবিগুলো মানতে হবে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য কে ডি যাদব, সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক ধীরেন্দ্র যাদব, সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির নেতৃস্থানীয় শশী যাদব, এ আই এস এ-র নেতা অভ্যুদয় এবং আর ওয়াই এ-র জাতীয় সভাপতি অমরজিৎ কুশওয়া প্রমুখ।

মিছিল শেষে জনসভায় কমরেড ধীরেন্দ্র যাদব পরদিনের ৭ মার্চ শিক্ষকদের সংগঠনগুলোর আহ্বানে বন্ধকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন, ‘‘যে শিক্ষকরা ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন-ধর্ণা-অবস্থান করে আসছিলেন তাঁদের উপর নীতীশ সরকার যেরকম বর্বরভাবে আক্রমণ নামায় এবং তারপরে আবার তাঁদের বিক্ষোভ মিছিলের উপর যে নৃশংস আচরণ করে, সেটা পরিষ্কার দেখিয়ে দেয় নীতীশ সরকার শিক্ষা ও শিক্ষকদের সম্পর্কে কী নিদারুণ বেদরদী; এটাও প্রমাণিত হচ্ছে এই সরকার একটা পুলিশ রাষ্ট্রে অধঃপতিত হয়েছে। বিহারে শিক্ষার আরও অবনতি হয়েছে এবং সরকারের সমস্ত মিথ্যাচার উন্মোচিত হয়ে গেছে। যে রাজ্যে শিক্ষকদের আন্দোলনকে কঠোরভাবে নিপীড়ন চালিয়ে দাবিয়ে রাখা হয় সেখানে শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা কী সেটা যে কেউ সহজেই বুঝে যাবেন।

বিহার পুলিশের নিপীড়ন শুধুমাত্র শিক্ষকদের উপর চলেছে তা নয়, একই নিপীড়ন নেমেছে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানো প্রতিবাদী ছাত্রদের উপরও। উত্তরোত্তর প্রতিবাদে সরকারের কুশপুতুল পুড়েছে রাজ্যের রাজধানী পাটনা সহ আরও অন্যান্য জেলায়ও। ৭ মার্চ শিক্ষকদের ডাক দেওয়া বিহার বন্ধ-এর দিন সরবে পথে নামে সি পি আই (এম এল)-এ আই এস এ-আর ওয়াই এ এবং আইন অমান্য করে গ্রেপ্তারও বরণ করে।

পাটনায় সি পি আই (এম এল) অনুমোদিত বিহার স্টেট প্রাইমারী টিচার্স এ্যাসোসিয়েশন (গোপ গোষ্ঠী), বিহার পঞ্চায়েত ও শহর বুনিয়াদী শিক্ষক সমিতি এবং নবনিযুক্ত শিক্ষক সমিতি একসাথে মিছিল করে।

প্রতিবাদী মিছিলকারিরা ১৯৯৮ সালে সংগঠিত নাগরি হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত আসামীদের সম্প্রতি বিহার হাই কোর্ট থেকে খালাস পাওয়ার বিরুদ্ধেও রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
ইংরাজী সাপ্তাহিক ‘‘আপডেট’’
গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)
‘‘লিবারেশন’’
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১০০ টাকা

ঘটনা ও প্রবণতা

বন্ধ চটকলে শ্রমিকদের ভাতা দিতে বলল কোর্ট

নৈহাটিতে বন্ধ গৌরীপুর জুট মিলের শ্রমিকদের প্রতি মাসে রাজ্য সরকারকে ১৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়ে প্রধান বিচারপতি অরুণ মিশ্র ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, কল্যাণকর রাষ্ট্র কর্মচ্যুত শ্রমিকদের এই অবস্থায় উদাসীন থাকতে পারে না।

গৌরীপুর জুট মিল দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ। ৩০০-রও বেশি স্থায়ী শ্রমিক এখন বেকার। আইনজীবী কেদারনাথ যাদব ঐ শ্রমিকদের দুর্দশার কথা জানিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন। এ দিন সেই মামলারই রায় দিয়েছে হাইকোর্ট। রাজ্যের শ্রমসচিব অমল রায়চৌধুরী জানান, কোনও কারখানা এক বছরের বেশি বন্ধ থাকলে শ্রমিকেরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এমনিতেই ১৫০০ টাকা করে মাসিক ভাতা পান। গৌরীপুর জুটমিলের শ্রমিকেরা কেন সেই ভাতা পাচ্ছিলেন না, তা দেখতে হবে।

এ দিন শুনানির সময় রাজ্য সরকারের পক্ষে আইনজীবী তপন মুখোপাধ্যায় জানান, ঐ চটকলটি বেসরকারি। কোম্পানী কোর্টে ঐ মিল নিয়ে মামলাও চালাচ্ছে। সরকারি আইনজীবীর ঐ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি জানান, সরকারি না বেসরকারি, সেটা প্রশ্ন নয়। বিষয়টি শ্রমিক-কল্যাণের। কোনও সরকার শ্রমিক-কল্যাণের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। ঐ শ্রমিকেরা অভুক্ত থাকলেও সরকারের কোনও ভূমিকা থাকবে না, তা হতে পারে না। ডিভিশন বেঞ্চের কাছে আইনজীবী কেদারনাথ যাদব অভিযোগ করেন, গৌরীপুর জুট মিলের জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকদের পি এফের টাকাও মেটানো হয়নি। কয়েক জন শ্রমিকের মৃত্যুও হয়েছে। রায়ে শ্রমিকদের এই দুর্দশার কথাও উল্লেখ করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য সরকারের কী সুযোগ-সুবিধা আছে, সরকারি আইনজীবী ডিভিশন বেঞ্চকে সেই বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু বোঝাতে পারেননি।

- *আনন্দবাজার, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩*

শিল্পে বিনিয়োগ রেকর্ড হারে কমেছে

রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্যে দেখা গিয়েছে, ২০১২ সালে রাজ্যে প্রকৃত বিনিয়োগ আসার পরিমাণ ৩১২ কোটি টাকা। পিছিয়ে যাওয়ার দৌড়ে যা গত দশ বছরে রেকর্ড। এদিকে এবার রাজ্য বাজেটে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মোট ১ লক্ষ ১২ হাজার ৭৬৯ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। সরকার শিল্পের জয়ঢাক বাজাতে বণিকসভার ঠাণ্ডাঘর থেকে মাঠে-ময়দানে এই পরিসংখ্যানটিকেই তুলে ধরেন বারবার। কিন্তু ‘প্রস্তাবে’র সঙ্গে ‘প্রকৃত বিনিয়োগ’-এর আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখে তাজ্জব সংশ্লিষ্ট মহল। সরকারি হিসাব বলছে, দার্জিলিং, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা ছাড়া কোনও জেলায় কোনও বিনিয়োগ কার্যকর হয়নি। এদিকে বাজেট প্রস্তাব পেশের সময় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্যে ১০ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু তা কোথায়, কীভাবে হল, তার কোনও উত্তর নেই। যেখানে শিল্পই নেই, সেখানে কে কাকে এত চাকরি দিল, তা নিয়ে হাসাহাসি শুরু হয়েছে বণিকমহলে। ... গত বছর যেখানে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পখাতে বরাদ্দ ছিল ৫০০ কোটি টাকা, তা এ বছর ৫৪০ কোটি টাকা হয়েছে। এই সামান্য বরাদ্দ বৃদ্ধি কতটা শিল্পজোয়ার আনবে, তা নিয়ে ধন্দে শিল্পমহল। ... বন্দর ও রেলসূত্রে পণ্য পরিবহণের যে হিসাব মিলেছে, তা শিল্পের দৈন্যদশাকেই সিলমোহর দিয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দর এবং জাহাজ বন্দরের গত ছ'টি আর্থিক বছরের পরিসংখ্যান বলছে, গোটা দেশের নিরীখে অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। ভারতের বন্দরগুলোতে যত পণ্য এসেছে বা গিয়েছে, তার ৪.৬২ শতাংশ মাত্র দখলে রাখতে পেরেছে রাজ্যের ঐ দুই বন্দর। যা ছ'বছরের নিরীখে সবচেয়ে কম। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হিসাব, রাজ্যে ২০১১ সালের তুলনায় গত বছর প্রায় ২০ হাজার কম সংখ্যক রেকে পণ্য বোঝাই হয়েছে। ...

বিনিয়োগের খতিয়ান (কোটি টাকায়)

সাল	বিনিয়োগ
২০০৮	৪৪৩৫
২০০৯	৮৪৯৩
২০১০	১৫০৫২
২০১১	২৪৬৫
২০১২	৩১২

- বর্তমান, ১২ মার্চ ২০১৩

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ও ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹-২ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com